রবীন্দ্রনাথের

পূরবী

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী
কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথের পূরবী

প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ সন্তোষকুমার ধর

মুদ্রণ ঃ ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ ব্রজ রায়চৌধুরী

ব্লক ঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

ব্লকমুদ্রণ ঃ মোহন প্রেস

তিন টাকা

আমার জীবনে প্রথম ও প্রধানতম অধ্যাপক

মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব

দিব্যধামপ্রাপ্ত শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সাধনামন্দির ঃ কলিকাতা-৮

২৬, ৮, ১৩৬৩

এই লেখকের কয়েকখানি বই ঃ

উপন্যাস ঃ যেতে নাহি দিব
সুন্দর, হে সুন্দর

গল্প ঃ এরা দু'জন

আলোচনা ঃ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথের পূরবী

কাব্য ঃ পূর্বরঙ্গ
স্বপ্ন ও সংগ্রাম
সূর্যজন্ম
মানবজমিন

যা নিয়ে আমি আছি তা যখন যায়, তখন সবই যায়। যদি দেহ-ই নিয়ে আছি, তবে দেহটুকু গেলেই আমি যাব। কিন্তু দেহ ছাড়া আরো কিছু নিয়ে যদি থাকি, "দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের" সাধনায় যদি থাকি, তবে দেহ গেলে-ও তা থাকবে, থাকবে আমার সৃষ্টির বেদনায়, আমার সন্ধানের আনন্দে।

মৃত্যু এসে দেহটাকে নিয়ে যায়; কিন্তু মনের সাধনায় যা পাই, যা দিই, আত্মার আনন্দে "স্বপ্নের ভুবনে" সৃষ্টি করি যে-বেদনা, যে-মঙ্গলমহত্ত্ব, তা তো সঞ্চারিত হওয়ার, তা কি যাওয়ার?

যখন দেহসর্বস্ব, বস্তুসর্বস্ব, তখন, কেবল তখন-ই, মৃত্যুভয়। যখন মনোদীক্ষা তখন ভয় নয়, বোধ: মৃত্যুভয় নয়, মৃত্যুবোধ অর্থাৎ মৃত্যুই অমৃত, এই চেতনা।

পূরবী কবির এই চেতনা।

সুখে সুপ্ত থাকি আর মোহে গুপ্ত থাকি, মৃত্যু একদিন আসবেই। যে-জীবনটিকে আঁকড়ে ধরে' আচ্ছন্ন আছি, অন্যতর কোনো অনাগতে সে-জীবনটিকে নিয়ে যাবেই। থাকতে কেউ আসি নি। যাব। যাচ্ছি।

যেতে যদি ভয় তবে গৃহী, তবে মোহ। যদি আনন্দ, তবে পথিক, তবে প্রেম। পূরবীতে এই পথিকপ্রেম। মৃত্যুকে প্রসন্নমনে মেনে নিয়েই জীবনযাপনের যে-প্রেম এবং জীবনোত্তরণের যে-বৈরাগ্য—পূরবী সেই প্রেম-বৈরাগ্যের চিরন্তন প্রভাতসংগীত।

যাব, এটা সত্য। রাঙাব, এটা সুন্দর। সত্যে যদি গতি, সুন্দরে রতি, মঙ্গলে তবে মতি। মঙ্গলের সহজ-প্রকাশেই মনোজীবনের সুপ্রভাত। মানবসমাজের অভ্যুদয়। বিশ্বপৃথিবীর শুভমুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তথা দর্শনে মনোজীবনের মুক্তি-ই মুক্তি। প্রেমে এই মুক্তি। প্রেম-ই মুক্তি। প্রেম নেই তো মন বন্দী। মন বন্দী তো মানুষ অন্ধ। রাহুর মত সে সূর্যগ্রাসী। "নিত্যকালের সূর্যকে সে এক গরাসে গিলে।" মানুষ যখন রাহুগ্রহ, সমাজ তখন সূর্যহীন আকাশ। আকাশে অমারাত্রি-ই যদি সত্য, প্রভাতচিন্তা তবে কবিকল্পনা। শান্তির ললিতবাণী তখন পরিহাসের ব্যাপার। তখন দম্ভ, দৈন্য, দুঃখ। তামসিক এই সমস্ত দুঃখদৈন্য উত্তরণের অভি-প্রায়ে মহত্তর যে-মার্মিক দুঃখচেতনা, সার্থক শিল্পরচনার তা উৎসভূমি। দুঃখোত্তীর্ণ তপস্যার উত্তরায়ণে রাহুমুক্ত যে-মহান সূর্য, পূরবীসুরের অভিসার সেই সূর্যসুন্দরের সাবিত্রী-প্রেমে।

পূরবীর কবি কবিদের কবি এই প্রেমের সাধনায়। অর্থাৎ দুঃখসাধনায় তিনি বেদনপ্রেমের লোককান্ত কবি; মৃত্যুবোধনায় তিনি চেতনপ্রেমের লোকোত্তর মহাকবি। বসন্ত-চেতনার মন্ত্রোদ্‌গাতা তিনি।

ঋতুরাজ বসন্তের মত ক্ষণকালীন এই মানবজীবন। আসে আর যায়। কিন্তু দান তার অনন্ত। সে গান দেয়। ধ্যান দেয়। প্রাণ জাগায় যৌবনের। মান বাড়ায় মানবপ্রকৃতির:

যতদিন আছি, মুক্তচিত্তে ভালোবাসি পৃথিবীকে, মানুষজনকে। যাবার সময় হলে ভাগ্য মানব এই জন্যে, যে, "তিমির রাত্রির বাণী" আস্বাদ করার ডাক এল। তাই একপল ও বিলম্ব করব না। "পথিকের ডাকে" দেব সাড়া। যাব চলে।

কিন্তু যেতে যেতে-ও যেন রাঙিয়ে যাই আকাশ—অস্ত-পথগামী সূর্যের মত, এই প্রার্থনা।

বসন্তপ্রার্থনা এরি নাম।

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু ঃ পূরবীর ভূমিকা

এক একটি বিশেষ জীবন নিয়ে প্রকাশের পৃথিবীতে আমরা আছি। আছি মানে চলতে চলতে, যেতে যেতে আছি। বিশেষ বেদনায় আছি বলে' প্রতীয়মান হলেও অশেষ-চেতনার অপ্রকাশ আনন্দলোকে প্রতি মুহূর্তেই আমরা যাচ্ছি। মৃত্যুসূর্যের অমৃত-আলোকে যাওয়ার জন্যেই আমাদের মর্ত্যজন্ম। মর্ত্যজন্মে আমরা নানাকারণে, নানাভাবে অপূর্ণ, 'অসমাপ্ত পরিচয়' এবং 'অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি' বাধ্য হয়েই আমাদের গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু 'সমাপ্তির ব্যথায়' আমাদের জন্মগত অধিকার বলে' 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'—যতদিন না পূর্ণত্বে লাভ করি পরমামুক্তি, মৃত্যু আমাদের গতির বার্তা শোনায়,—নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা শোনায় জীবচেতনার সুরলোকে।

বিশেষজীবনে মৃত্যু মৃত্যু, অশেষজীবনে মৃত্যু অমৃত।

'বিশেষে থাকি আর অশেষেই জাগি—মৃত্যু যথাকালে আসবে, আমাদের তুলে নেবে। এই তুলে-নেয়ার কথায় যদি ভয়, তবে মৃত্যু 'বিধির বৃহৎ পরিহাস'; যদি প্রেম, তবে মৃত্যুর অন্তরে অমৃত। তখন মৃত্যুর কবলে সকলকেই যেতে হবে—ভয়ার্ত এই ক্রন্দনের চেয়ে অধিকতর সত্য এই আনন্দ-ঘোষণা ঃ মৃত্যুতে আমাদের জন্মগত অধিকার। সুখ কিংবা দুঃখে, আশা কিংবা নৈরাশ্যে, বেদনা কিংবা চেতনায় ইহজন্মে আমাদের অধিকার থাকতে-ও পারে, না-ও পারে, কিন্তু নিতান্ত নগণ্য হয়ে-ও আমরা তখন বলতে পারি—মৃত্যুতে আমাদের অধিকার। আজ না-হয় কাল, কাল না-হয় পরশু তাকে পাব ঃ জন্মের পূর্বে যে-অন্ধকার সূর্যলোকে সর্বব্যাপী অখণ্ডতার আনন্দে আমরা ছিলুম, মৃত্যু-অধিকারের অমৃত-মহিমায় 'নিগূঢ় সুন্দর' সেই 'অন্ধকারের'

জ্যোতিষ্কজগতেই আবার প্রত্যাগত হব। অন্য সকল কথায় তর্ক আছে, বিতর্ক আছে, কিন্তু মৃত্যুকথায় বিতর্ক নেই। এ সত্য। চেতনা দিয়ে এটা উপলব্ধি করি তো এ সুন্দর অর্থাৎ শিল্পের আত্মা, এবং শিব অর্থাৎ জীবনের মাহাত্ম্য।

যাদের ভালবাসি তারা অনেকেই চলে গেছে, যারা আছে তারা-ও যাবে। আসবে যারা, যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে-ই তারা আসবে। আসা মানেই যেতে আসা। আমরা এসেছি, চলে যেতেই এসেছি। যাচ্ছি।

যাচ্ছি—এটা নিয়ত সত্য, এটা নিয়তি। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ চলে না। যদি চলতো, কিংবা চলতে পারে বলে' ক্ষীণতম কিছু আশা-ও থাকতো, তবে সভা করে', মিছিল বার করে', মৃত্যুর বিরুদ্ধে বেশ একটা জোরালো প্রস্তাব পাশ করে' সর্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তার কাছে তা পাঠাবার ব্যবস্থা করা যেত। বক্তৃতার বেগে বলা-ও যেত: তোমার সৃষ্টির প্রাঙ্গণে মৃত্যুর মত একটা সর্বগ্রাসী দুষ্ট দস্যুর 'ডেস্‌পটিজ্‌ম্' বহুকাল সহেছি, আর সইব না।

কিন্তু সইতেই হয়। পৃথিবীর এই মাটিতে মৌরস পাট্টা গেড়ে চিরকাল যে থাকব তার উপায় নেই। আমাদের যেতেই হয়। কিন্তু এ-কথা নাকি সত্য, যে আমাদের মরা হাড়ের সার পেয়ে মাটি আবার উর্বরা হয়, কোথা থেকে নূতন প্রাণের তরুদল সেই মাটিতে ওঠে গজিয়ে, প্রণাম জানায় নবজীবনের প্রভাতসূর্যে?

মোহাচ্ছন্ন জীবনে এটা অবশ্য একটা কথার কথা মাত্র—কল্পসর্বস্ব কবিত্ব মাত্র। আমাদের মৃত্যুর সুযোগে অন্য কে বা কারা এল, যুগে যুগে প্রতিযুগেই আসে,—আর সেই আসার স্পন্দনে আমাদেরো পরোক্ষ প্রাণ লীলা করে নূতন ছন্দে—খণ্ডবোধে এটা আমরা বুঝি নে, বুঝতে পারি নে। গেল, গেল—খণ্ডবোধের এই নিষ্ফল হাহাকার-ই বাস্তব সত্য। গেল বলেই এল, এবং এল বলেই যাবে বা যাচ্ছে—এই সমগ্রবোধের আনন্দসান্ত্বনা পেয়েও আমরা পাইনে।

ইহজীবনকেই সব ভেবে ইহলোকটাকেই তাই জয় করতে চাই। দম্ভভরে আমরা লুঠ করি সংসার, 'রক্তধূলির পথ-বিপথে' ছুটে চলি 'মত্ত অধীর'। আমরা

বলি, যা কিছু অজানা, রাত্রির অবগুণ্ঠনে যা গুপ্ত, যা রহস্য—ইহজীবনেই আমরা তা আবিষ্কার করব, অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে' 'নিত্যকালের বিত্তরাশি' নেব ছিনিয়ে, 'ধরিত্রীকে ভোগের দাসী' করে 'বিজয়ী' হব ইহজীবনে।

কিন্তু 'মহেশ্বরের বিশ্ব' সহ্য করে না আমাদের দম্ভ-বিকার। আমাদের মৌরস পাট্টা গাড়ার মত্তমশাল 'রাত্রিরাণীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ' করবে কি, রাত্রি-শেষে 'লুপ্তিধূলায়' ভস্ম হয়ে 'মাগে সুপ্তি'। আর আমাদের দম্ভমশালের ভস্মের শিয়রে নব-প্রভাতের সূর্য ওঠে। 'দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে'।

চলমান প্রাণ-ই তিমির-মথন নবীন সূর্য। দম্ভের বিকারে প্রাণ যদি যা পেয়েছে তা-তেই থাকতে চায়, 'লক্ষমণির রাজার বেশে' দেখতে চায় 'যক্ষপুরীর' চির-স্থায়িত্ব—প্রাণ তবে অচলায়তনের নিরন্ধ্র অন্ধকার। মোহাচ্ছন্ন নিশ্চল প্রাণের গতিবিহীন ভোগাসক্তিকে বাস্তব বলে' আমরা পোষণ করতে পারি, কিন্তু অধিকতর মহত্তর আর এক বাস্তব প্রমুদিত হয় আমাদের জীবনে, অর্থাৎ মহেশ্বরের বিশ্ব থেকে মৃত্যু আসে আমাদের আসক্তি থেকে মুক্তি দিতে। প্রাণ তখন বাস্তব স্বরূপে হয় প্রত্যাগত, হয় চলমান। 'বিজয়ী' হয় 'আলোকের জয়' গান গেয়ে।

মানুষের জীবন যদি 'ডায়নামিক'—সে চলতে চায়, ফলতে চায়, নূতন আনন্দে গলতে চায়, তবে মৃত্যুর মঙ্গলবাদে অনাস্থা জ্ঞাপন করা মূঢ়তা মাত্র। ডায়নামিক হব, আবার মাটি কামড়ে আসক্তির মোহরসে বুঁদ হয়ে যা-আছি ঠিক তাই-ই থাকব, ছাড়ব না, বাড়ব না, মৃত্যু-মঙ্গলে মানব না—এটা তো কথার কথা নয়। চলাটাই যদি জীবন, তবে যে-শক্তিবলে আমরা থামতে চাই না, অহরহ চলি—তা অবশ্যই জীবনবিরোধী তত্ত্ব নয়। মোহাসক্তিতে আমরা অচল হতে চাই, মৃত্যু এসে মিত্রের কাজ করে, অচল থাকতে আমাদের দেয় না।

আমরা জন্মান্তরবাদী। এদেশে এই গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র। মৃত্যু আমাদের শাশ্বত গতিপথের দ্বার খুলে দেয়। যে চলতে চায় না তাকে-ও মৃত্যু লোক-লোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়। জন্মান্তরবাদী এমন দেশে মানুষ কেন জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি কৃত্রিম বাঁধনে বদ্ধ হতে চায় তাই ভাবি। জন্মজন্মান্তরে কত জাতি কত

কত ধর্ম কত কত দেশ দেখে এসেচি; আরও কত দেখবো। তবে কেন এই সংকীর্ণতা? আমার সর্বজাতীয়তার মূল এখানেই। কারণ কত দেশ কত জাতির মধ্য দিয়ে আমরা এসেচি ও কত দেশ ও কত জাতির মধ্যে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতে যেতে হবে। কেউ তো আমাদের পর নয়, কেউ তো শত্রু নয়।

ভাল করে ভেবে দেখলে এই জন্মান্তরবাদ বুদ্ধদেবের মত সর্বজীবে মৈত্রী না হয়ে যায় না। গতির মত মুক্তিদাতা আর নেই। *

গতি যদি মুক্তিদাতা, এবং মৃত্যু গতির আত্মা, তবে জীবনের পক্ষে মৃত্যু নবজীবনে মহতী মুক্তি। মৃত্যু জীবনের বিপরীত কোনো তত্ত্ব নয়, জীবনেরই তা অর্থান্তর, রূপান্তর।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যু মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করে-ও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যু-ই নয়, সে জীবন।১

আমাদের প্রাত্যহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা কর্ম ও বিশ্রামের জীবনে কবির এই মৃত্যুতত্ত্ব সহজে যে গ্রহণ করতে পারি না, তা সত্য। কবি তা জানেন :

ঘরকরনার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে, সমস্ত আপত্তি অতিক্রম করে, মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে তখন তাকে দস্যু বলে ভ্রম হয; তখন তার হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ করবার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত; আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।২

গতির জীবনকে যখন আন্তরিকভাবে-ই সমর্থন করি, তখন, কেবল তখন-ই, মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে। গতিকে সত্য বলে' মানি, অথচ ইহজীবনে সুখশান্তি, নেয়া-দেয়া, প্রাপ্তি-প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতি ভাবতত্ত্বের বাঁধন কোনোমতেই আলগা করতে চাই নে, মানসদ্বন্দ্বের এইটেই

* কবিগুরুর উক্তি। দ্রষ্টব্য বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ১৭।

১ আত্মপরিচয়, পৃঃ ৭০ ২ যাত্রী, পৃঃ ১৪৩

তো প্রধান কারণ। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি বৈরাগ্য-বুদ্ধির প্রজ্ঞাপ্রাবীণ্যে কিংবা বার্ধক্যজনিত ভোগরাহিত্যের বেদনায়। বৃদ্ধবয়সে ইহজীবনটা যখন ভার বলে' মানুষ মনে করে, শারীর অসুস্থতায়, মানসিক দুঃখদৈন্যে, আধিদৈবিক নানা বিপৎপাতে যখন ভগবান ডাকে অন্তরে বাইরে—তখন তার কাছে মৃত্যু-ই একমাত্র আশা, সান্ত্বনা। কিন্তু এটা হ'ল দায়ে পড়ে মৃত্যু মহিমার স্বীকৃতি। চিত্ত-চৈতন্যের সূর্যোদয় নেই এর আকাশে। বৈরাগ্য-বুদ্ধির প্রাবীণ্যে গতির গভীরতত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেন, যৌবনেই তিনি জীবনবেগেই আস্বাদ করেন মৃত্যুর মহত্ত্ব, মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জেনেই পথ চলেন প্রেমের আনন্দে। তিনি, কেবল তিনি-ই, জানেন—জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপেই মৃত্যুর করুণা তিনি পান। আজ থেকে কালে তিনি যখন পা বাড়ান, তিনি জানেন—আজ-এর অন্তর ভেদ করে' কাল যে সমায়াত হ'ল—এটা মৃত্যুর-ই মহান দান। আজ-ই আমার কাছে সত্য, অতীত নয়, আগামী নয়—এই যে ভাব, এর নাম খণ্ড-ভাব, একেই বলি বস্তুবুদ্ধি যার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য মোহ। মোহ-ভাবে প্রভাবিত হয়ে জীবন যদি থেমে থাকতে পারত, কথা ছিল না। কিন্তু জীবন এ-ভাবে কোনো কালে থাকে নি, থাকে না। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সে চলে।

জীবনের বিপরীত তত্ত্ব হ'ল মোহ। মোহ-ই জীবনকে আটকে রাখতে চায় কোনো বিষয়ে বা বস্তুতে। জীবন যদি চলমান তবে কারো প্রভাবে বা কোনো প্রভাবে তাকে অচল হলে চলে না ; কারণ জীবনের পক্ষে সেটাই হবে অপ্রাকৃত এবং অবাস্তব। মোহকে যে 'রিয়াল' বলি সেটা স্থিতির জীবনের সীমিত বুদ্ধিবিচারেই বলি। গতির জীবনে মোহটার মত আনরিয়াল তত্ত্ব আর দুটি নেই।

অথচ আনরিয়াল এই মোহ ব্যাপারেই আমাদের মন। বস্তুমোহ, রূপমোহ, যশোমোহ, অর্থমোহ--কত মোহের মায়াঞ্জন-ই না আমাদের চোখে। বস্তু যদি কিছু পাই, তা ত্যাগ করতে আর মন সরে না ; রূপে যদি মন ভোলে, যৌবন ব্যগ্র হয় উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে : 'বাঞ্ছা ফিরে বাঞ্ছিতেরে ঘুরে'

লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা'। আর যশোমোহে মানুষ কী না করে, অর্থমোহে কত না কাঙাল হয় অন্তরে বাইরে।

স্থিতির জীবনেই এত সব হয়—কিন্তু বুঝতে চাই আর না চাই, দিনের পর দিন যায়, আয়ু কমে আসে অর্থাৎ আমাদের চলতে হয় বধমানতার অনন্ত পথে, যথাকালে তাই আসে মহাকাল। 'যাবো না' বলে' কেঁদে তখন লাভ নেই।

অবশ্য মোহ যদি তখন কেটে থাকে 'যাবো না' বলে' তবে কাঁদি না; শান্ত মনে অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিয়েই 'পূরবীর' গান গাই, 'দিনান্ত সংগীতে'র সুররহস্যটির সন্ধান করি। অর্থাৎ মৃত্যু আসবেই, যখন জানি, অন্য কথায়—মৃত্যুতে আমাদের জন্মগত অধিকার, এটা যখন স্পষ্টত-ই জানা হয়েছে, তখন তার জন্যে ইহজীবনটিকে প্রস্তুত রেখেই প্রেমজীবনে হই অগ্রসর। বলি ঃ 'যারা আমার সাঝ-সকালে গানের দীপে' আলো জ্বালিয়ে দিল, সেই 'আমার আপন মানুষগুলি-কে' আমি ভুলি নে। 'আঁখির নাগাল এড়িয়ে' 'সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে' তারা যখন একে একে চলে যায়, এ-কথা খুবই সত্য যে, জীবন হয় রিক্ত, শীর্ণ; বুঝতে পারি, ভালবেসেছি যাদের, তাদের 'যেতে নাহি দিব' বলে কাঁদি বটে, তবু তাদের যেতে দিতে হয়। কিন্তু যেতে দিতে হয় বলে' প্রেম কি মানা মানে? মৃত্যুর মত প্রেম-ও যে সত্য। প্রেম বলে, প্রিয়জনের শারীর রূপমূর্তিগুলি রাখতে পারি না সত্যকথা, কিন্তু মনোমন্দিরে স্মৃতিমূর্তিগুলির পূজা কি করতে পারি না? আমার বাঁচার আনন্দে আমার প্রিয়তমের বাঁচাটি কি আপন সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে পায় না পথ?

প্রেম যখন বিশ্বকে জানে, তখন সে সর্বানুভূ, সে সর্বজগদগত। সে অতীত, সে ভবিষ্যৎ, সে বর্তমান। স্মৃতিপূজায় সে অতীতে প্রত্যাবর্তন করে, স্বপ্নপূজায় গতি নেয় ভবিষ্যতে, আবার রতিপূজায় 'পাশে' যারা আছে, গানের দীপে আলো দেয় জ্বালিয়ে, ভাবনা ভাবে তাদের।

অখণ্ড চেতনার এই বেদনানন্দে জীবমৃত্যু সত্য আবার প্রেমামৃত-ও সত্য। বিশেষ কোনো জগতের চিরন্তনী স্থিতি নেই মানবজীবনে, সর্বজগতে

তার অবিশ্রান্ত গতি, আর গতি মানেই তো নবতর জন্ম। এক জগত থেকে আর জগতে, এক জীবন থেকে আর এক জীবনে অহরহ নিয়ে-চলার শক্তির নামই তো মৃত্যু। এটি নেই তো গতি নেই, গতি নেই তো নবজন্মও নেই। মৃত্যুর এই নবজন্মতত্ত্বের আনন্দোপলব্ধির নাম অমৃত। অমৃত আছে। আছে মৃত্যুতে, আছে প্রেমে।

পূরবী-কাব্যের এই 'স্থির মীমাংসা'। 'কবিহৃদয়ের বৈচিত্র্যের শেষ' * নেই সত্য, কিন্তু মৃত্যুর অমোঘতা ও প্রেমের চিরন্তনতা—এই দুই তত্ত্বের অদ্বয় জীবনবোধ-ই পূরবীকাব্যের ঐক্যতত্ত্ব। এই তত্ত্ব-গভীরে প্রবেশ-পথ পেলেই বোঝা যায়—দিনজীবন অর্থাৎ প্রকাশলোকের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গৃহ-জীবন যেমন গ্রহনীয়, দিনান্তজীবন অর্থাৎ অপ্রকাশলোকের অতীন্দ্রিয় 'পথ'-জীবন তেমনি বরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘর' ও 'পথ' সম্পর্কিত তত্ত্বটি এ-স্থলে উল্লেখ করলে প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হতে পারে।

কবি বলছেন ঃ

> ঘর বলে, পেয়েছি; পথ বলে, পাই নি। মানুষের কাছে "পেয়েছি" তারও একটা ডাক আছে আর "পাই নি" তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু "পেয়েছি" বদ্ধ গুহা, শুধু "পাই নি" অসীম মরুভূমি।' †

পাই নি বলে পথ চলি এটা সত্য, আবার পেয়েছি বলে ঘরে থাকি এটাও সত্য, সন্ন্যাসীর না হতে পারে, কিন্তু মানুষের সত্য। অর্থাৎ যতটুকু পেয়েছি ততটুকুতেই তৃপ্ত হই নে বটে, কিন্তু যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ পাওয়া-কে অস্বীকার করি নে, মায়া বলে' উপেক্ষা করি নে।

যারা পাশে আছে তাদের তাই ভালবাসি, 'জীবনের অপরাহ্ণবেলায়' হাতে রাখি হাত, বলি ঃ 'এই ভালো, এই ভালো'। যতদিন আছি ভালবাসি

* ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৩৮।৩৯,

† যাত্রী, পৃঃ ১১৪,

এই মাটিকে, এই মানুষকে, এই প্রকৃতিকে। ভালবাসা যদি মোহমুক্ত হয় তবে-ই চলতে চলতেই অনেক দিতে পাই, আর সেই দিতে পারার পুলকে নূতন করে চলতে পাই পথ।

নূতন করে 'পথ' চলার আনন্দ যার আছে, উপলব্ধ হয়েছে, ফুরিয়ে গিয়েও সে ফুরিয়ে যায় না, 'বেদনার খেলা' তার ফুরায় না কিছুতে। নব নব বেদনার অভ্যুদয়ে তার চেতনার 'লীলাসঙ্গিনী'; নব নব প্রেরণার লীলাচাপল্যে তার বেদনার 'অন্ধকার'; নব নব বেদনার অন্ধকারে তার চেতনার 'প্রবাহিনী'—গতি তার এ-পার ও-পার, দুই পারে-ই: 'যোগীশ্বরের জটা'-কে সে মানে, 'বৃদ্ধবটের লুব্ধ শিকড়'-কে সে জানে। আসক্তির মোহ-শিকড়কে ছুঁয়ে যেতে সে ভয় পায় না, বৈরাগ্যগতির জটান্ধকারের রহস্যভেদে তার উৎসাহ কমে না। প্রেম ও মৃত্যু, দিন ও সন্ধ্যা, মাটি ও আকাশ—সকল কূলেই তার নৃত্যলীলা, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ কূলকে একান্ত সত্য বলে' তারই বন্ধনে স্তব্ধ হওয়ার মূঢ়তা নেই তার বাসনায়।

মোহ-ই, বলেছি, এককূলে মানুষকে টেনে রাখে। মোহ নেই তো বিশেষ কোনো কূল নেই, জীবনগতির ছন্দঃপাতে কোনো ভুল নেই। মৃত্যুর আশীর্বাদে মানুষ মোহবন্দী হয়েও হতে পারে না, মুক্তি তাকে পেতেই হয়। মুক্তিতে মানুষের অধিকার, বলা বাহুল্য, এই মৃত্যুর মহাদেবটি আছেন বলে'। অপরাহ্ণ শেষ হলেই বিষাণে তার পূরবী বাজে: সে-সুরে প্রাণ যায়-ই যায়, যেমন যায় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী শুনে শ্রীরাধার মন।

নূতন মায়ের প্রসববেদনা উঠল, বুঝলাম, মহাসন্তানের জন্মদিন আসছে। অন্ধকার গর্ভ থেকে জন্ম হ'ল সন্তানের, ভয় পেয়েছিলাম কী জানি কী হবে কিন্তু জন্ম হ'ল, ভয় গেল দূরে, প্রাপ্তির সুরে পূর্ণ হ'ল জীবনযৌবন। নব জন্ম-সম্ভাবনায়, ঠিক তেমনতর, জীবজীবনে মৃত্যুবেদনা হ'ল অনুভূত, পূরবীর সুর ধ্বনিত হ'ল আকাশে, বুঝলাম, তিমিরভেদ করে আলোকে চলার সূর্যজন্ম হচ্ছে সন্নিকট। সেই আলোকের তুলনায় ইহলোকের এই আলো-ও

যেন অন্ধকার গর্ভ মাত্র। এই গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে হবে সেই বিপুল আলোকে—অবশ্যম্ভাবী এই নিয়তি : যেতে-ই হবে, ভয় পাচ্ছি কী জানি কী হবে, কিন্তু মৃত্যুজন্মে জাগরণ এলেই জানা যাবে পরম সত্য সেই তিমিরান্ধকারের নবীন সূর্য : অপূর্ণ ইহলোক সেই সূর্যলোকে সমাম্নাত হয়েই হয় পূর্ণ। 'ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন' শারীর এই বিশেষ জীবন থেকে যথাকালে তাই খসিয়ে ফেলা চাই। 'সর্ব আবরণ লীন' করে দিতে না পারলে পূর্ণ হব কি করে, 'চিরন্তনের' আনন্দ-ই বা আস্বাদ করব কী গুণে? যাব-ই বা কি করে' সেই অগমলোকের সূর্য আলোকে।

> ···সেই বিশ্বচিত্তলোকে যেথা সুগম্ভীর বাজে
> অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীত ধারায়
> ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
>
> —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এ-লোকে যা দেখি, শুনি, করি, ভাবি—তা সব তো সে-লোকের-ই আলোকাভাস। ইহলোক বা ইহজীবন তাই মিথ্যা নয়, কিন্তু না বললে-ও চলে, তা অপূর্ণ। এই লোকের সঙ্গে সেই লোকের মিলনে প্রতিভাত হন পূর্ণজীবনের অখণ্ডদেবতা। সেই দেবতার আরাধনায় যখন আছি, তখন মৃত্যু তো আমার পরম মিত্র, সে তো আমাকে নিতে এসেছে অপূর্ণ থেকে পূর্ণ প্রকাশের শিবলোকে।

জীবনের সন্ধ্যা যখন এল তখন তাই হাহাকার নয়, নৈরাশ্য নয়, তখন নবপ্রত্যাশার নূতন সুর, তখন পূরবী। তখন এ-লোক সত্য, তাই প্রেম; ও-লোক সত্য, তাই গতি, মৃত্যু। তখন ভালবেসে যারা চলে গেছে, তাদের স্মৃতিতর্পণ :

> আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
> বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
> সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—
> সব মানি—সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন
>
> —কৃতজ্ঞ।

গতির উধাও পথে সব কিছুই গেছে চলে, সঙ্গীহীন এ জীবন শ্রীহীন হয়ে শূন্য ঘরে আছে পড়ে তা-ও জানি ; কিন্তু তুমি যে ছিলে, প্রেমের সেই স্মৃতি-সান্ত্বনাটি কি গেছে ? দুঃখের মধ্যেও আনন্দ রচনা করি কী গুণে ? বেঁচে আছি, চলছি, প্রতিমুহূর্তে তোমার স্মৃতির বেদনায় নব চেতনার সৌভাগ্য করছি অনুভব, ইহজীবনে এ কি মিথ্যা ?

তাই আজ-ও যারা আছে কাছে, প্রেমের চেতনায় পূর্ণ করছে হৃদয়, ইহলোকে সেই তাদের আনন্দ-অস্তিত্ব কেন-ই বা অস্বীকার করব ? যে-কয়দিন আছি এখনো প্রেমের ঋণ কেন করব না পরিশোধ ?

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।
—শেষ বসন্ত।

যথাকালে চলে যাব, কালকে ফাঁকি দিয়ে রূপসৌন্দর্যে মত্ত হয়ে থাকার মোহ আমার নেই। মোহ নয়, প্রেমের আমি সাধক, তাই থাকি তো দিই, যাই তো পাই। সুতরাং ভাবনা রেখো না, সংশয় রেখো না কোনো। এখনো সূর্য অস্ত যায় নি, গেলেই দেখো।

সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে
সমুখের পথ দিয়ে
ফিরে দেখা হবে না তোমার।
—শেষ বসন্ত।

হবে না, কারণ অন্যলোকে নবতর রসতত্ত্বে হব নিমজ্জিত।

'উৎসর্গের' একটি কবিতায় ইতঃপূর্বে এ-কথা কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন। মোহবশেই আমরা একধরাতলেই থাকতে চাই, কিন্তু বিরাট এই নক্ষত্রাকাশে

কত সূর্য, কত সৌরজগৎ, কত পৃথিবী তো আছে—সে-সমস্ত কি শূন্য হয়ে থাকবে প্রেমজীবনে? প্রেম যদি সর্বজগদ্গত, প্রেমের আশীর্বাদে মৃত্যুর দ্বারা সর্বমোহ ছিন্ন করতে করতে অগ্রসর হব মহা-একের পূজাভিলাষে:

অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাবো রেখে
নব নব বিকাশের বর্ণ যাবো এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যু হতে
তোমারে পূজিতে যাবো জগতে জগতে।

পূজা-ভাবের আনন্দে জগতে-জগতে নিত্যগতি-ই তো জীবনপ্রেম। এই তো রস। এই রসের সন্ধানে জীবনসায়াহ্নে আজ—নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে' যাব মেতে। 'খেলাব গুরু' আমার 'বীণা' বাজাবেন সেখানে, আমি বাজাব বাঁশি। বীণার সুরে বাঁশির সুর যদি মিলিয়ে দিতে পারি, বৃহতের সুরের সঙ্গে আমাব সুরের সামঞ্জস্য যদি ঘটে, 'পূর্ণ হবে রাতি'।

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।

—খেলা।

এখন 'পূর্ণ' নয়, কিন্তু তখন 'হবে'। 'তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে' সেই খেলা সুরু হবে, বৃহতের সঙ্গে আমার কোনো দ্বন্দ্বই আর থাকবে না, তখন পূর্ণ হবে। এখন, ইহজীবনে, 'অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি, নিতে হয়, 'নিতে হল'। কিন্তু রাত্রিলোকের অসীম তিমিরে পূর্ণত্বের বরণডালি মিলবে।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নবজন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।

—আহ্বান।

যখন নীরব হব, লোকে ভাববে আমার গান বুঝি গেল থেমে। কেউ জানবে না নবতর ছন্দে নবজন্মের ভৈরবী বাজবে আমার সত্তায়। দিনের সংগীত যদি সরবতার সৌন্দর্যে, দিনান্তসংগীত তবে নীরবতার রহস্যে। দিনের ভাষা আর দিনান্তের ভাষা এক নয়, ছন্দও তার নয় এক। দিনের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে—তার রূপগত ঔজ্জ্বল্যে ও শব্দগত মাধুর্যে প্রভাবিত ও আলোকিত হয়ে থাকি বলেই দিনান্তের তিমিরমৌনের সূর্যলোকটিকে নেতির শূন্যতা বলে ভুল করি। সরবতাই শুধু জীবনজন্ম নয়, নীরবতাও নূতনতর আর এক জীবনজন্ম। সেখানকার প্রভাতী ভৈরবী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবশ্যই নয়, দিনজীবনের ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা যে ভৈরবী শুনব না, বুঝব না। ইন্দ্রিয়ের ঐশ্বর্য বড় মহান ঐশ্বর্য, কিন্তু দিনজীবনেই তা প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয়, দিনান্তজীবনে নয়। কে না জানে এদেশের 'কারেন্সি নোট' আন্‌দেশে একেবারেই অচল। আন্‌দেশে যখন যাই তখন সেগুলিকে নিই নে সঙ্গে, সেগুলি যতই মূল্যবান হ'ক, সুন্দর হ'ক, চকচকে-ঝকঝকে হ'ক, ত্যাগ করে যাই বিজ্ঞের প্রসন্নতায়। এই ত্যাগ নেতি নয়, শূন্যতা নয়, নৈরাশ্যও নয়, নূতনতর সম্পদসন্ধানের উদ্দেশ্যে তা অগ্রগতি।

পঞ্চইন্দ্রিয়ের শক্তি দ্বারা সর্বব্যাপী বিশ্বছন্দের পঞ্চধা পরিচয়-ই আমরা পেতে পারি। আরো যা আছে লোকায়ত এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজীবনে তা ধরতে পারি না, পেতে পারি না।

কবিগুরু বলছেন,

> এই পৃথিবীতে আমাদের পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বছন্দের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিচয় হোলো রূপরসগন্ধস্পর্শ-শব্দে। রূপ হোলো এই পঞ্চপরিচয়ের আদিতে, শব্দ হোলো তার সর্বশেষে। সর্বত্রই অণুপরমাণুর বিশেষ বিশেষ রকমের তরঙ্গলীলা। রূপেতে যে তরঙ্গমালা চলেচে তার খুব উঁচুতেও আমরা দেখতে পাই না, খুব নিচুতেও দেখবার শক্তি আমাদের নেই। লালের নীচে বা বেগুনী রঙের উপরে দেখবার শক্তি আমাদের নেই। ঐটুকু দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যেই সাতটি বর্ণের ছন্দোলীলা। আবার শব্দে-ও আমরা খুব উঁচু বা নীচু তরঙ্গ শুনতে পাইনে। তার মধ্যে ঠিক সেইরূপ ছন্দে সপ্তস্বরের বিহার। কাজেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদি ও অন্ত অর্থাৎ রূপ ও শব্দের ক্ষেত্রে একই রকমের ছন্দোময়ী সপ্তকলীলার পরিচয় মেলে। হয়তো এই ছন্দোলীলাটি আরও অগণিত ক্ষেত্রে আছে কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের পরিচয় পাবার উপায় নেই। যতদূর দেখতে পাই তাতে দেখচি ছন্দ হতে ছন্দে বিশ্বরূপে এক অপরূপ লীলা। পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে তার পঞ্চধা পরিচয় মাত্র আমরা এই জীবনে পেয়েছি। আর পরিচয় আমরা পাব কেমন করে? *

দিনজীবনে তা পাব না, 'অসমাপ্ত পরিচয়'টুকু নিয়েই তাই শান্ত থাকতে হবে। কিন্তু দিনান্তজীবনে-ও কি পাব না? পাব।

> ওগো বৈতরণী,
> অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
> সেথায় নির্জনে
> দেখি আমি আপনার মনে
> তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
> সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে
> শ্রবণের পরপারে
> তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
>
> —বৈতরণী।

তবে তো বৈতরণী, মৃত্যুনদী নামে কথিত হলে-ও, কোনো 'নেতি'-র নদী নয়; তার 'ধ্বনি' নেই, 'তরঙ্গভঙ্গিমা' নেই, 'রূপ' নেই, 'স্পর্শ' নেই, ছন্দে কোনো 'সীমা' নেই, 'অমাবস্যারজনীর সুপ্তিসুগভীর মৌনী প্রহরীর মত

* বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃঃ ২৮,

নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে' তা অহরহ প্রধাবিত, তবু তা' নেতির নদী নয়, তা সর্বপ্রাপ্তির চেতনা, তা সর্বসমারোহের চিদ্‌ঘন অখণ্ড আনন্দ।

এ আনন্দে চলেছে নিখিল মানবযাত্রী। যতই নগণ্য হই না কেন, প্রেমের পুণ্যে আমারো ললাটে সেই নিত্য চলার অবাধ অধিকার। পূর্ণ জীবনের স্বাদ আমাদের পেতেই হবে। দিনের কর্ম শেষ হলে-ই, শুনি আর না-ই শুনি, দিনান্তের ডাক আসবে। তখন নবরাজ্য অভিযানে আমরা চলব। তখন

দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্রপর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক—
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।
—মৃত্যুর আহ্বান।

কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংশয় কি তিরোহিত হ'ল ?—বালকদের প্রশ্ন।

'মাঠের পথের একপাশে' একদা ঘাসের ওপর একটা 'পশুর কঙ্কাল' পড়ে থাকতে দেখে মৃত্যু-সম্বন্ধে কবির সংশয় কি একটুও জাগে নি, প্রথমটা মনে কি হয় নি ঃ

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি ?
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলি নির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ
সেথায় তোমার-ও অন্ত, ভেদ নাহি লেশ !
তোমার-ও প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে !
—কঙ্কাল।

দেহগত প্রাণটুকু মাত্র নিয়ে মানুষসমাজে পশুর মত যারা বাঁচতে চায়, খায়, দায়, ভোগ করে, বংশবৃদ্ধি করে, তারপর প্রাণটুকু উড়ে গেলেই ঘুরে' পড়ে মাটিতে, কঙ্কালের পরিণাম হতে পারে তাদের-ই। তাদের বেঁচে-থাকাটা 'অল্প লইয়া' বেঁচে-থাকা, তাই 'যাহা যায় তাহা' একেবারেই যায়, কিছু থাকে না। তাদের কাছে-ই মৃত্যু 'শূন্যতার পরিহাস' মাত্র।

প্রেমে, ত্যাগে, দানে, গানে—মানবিক মাহাত্ম্য বিকাশের সজ্ঞান সাধনায় —দেহগত প্রাণ যখন সর্বগত নির্মল মনের আনন্দ-প্রশান্তিতে জন্মলাভ করে, অহং রূপান্তরিত হয় আত্মমহত্ত্বের জ্যোতি-সৌন্দর্যে, তখন মানুষের 'মর্ত্যসীমা' হয় চূর্ণিত, 'দেবতার অমর মহিমা' প্রমুদিত হয় জীবনে। জীবন তখন তো দেহসর্বস্ব বা প্রাণসর্বস্ব আর নয়, তখন তা দেহ-অন্তে-ও থাকে, থাকে অমৃত-যাত্রার আনন্দে, প্রাণের অবসানে-ও তার লয় নেই, কারণ মৃত্যুঞ্জয় সে গানজীবনের জ্যোতির্দীপ্ত রোমাঞ্চে।

মৃত্যু ততক্ষণ-ই মৃত্যু, যতক্ষণ শারীরিকতায় আমি সীমিত। আধ্যাত্মিক দিব্য চেতনায় যখন উদ্দীপ্ত, মৃত্যু তখন অমৃতলোকের সহযাত্রী!

আমি যেমন, মৃত্যুর প্রকাশ আমার কাছে তেমনতর। যদি অহম্ মাত্র, তবে পশুর কঙ্কাল আমার পরিণাম। যদি প্রেম, 'মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ?'

চির সুন্দরের পূজায় মনোজীবন আমার নিত্য প্রস্তুত, এই জন্য নিত্য গতি আমার, 'কঙ্কালের সীমানায় এসে' থেমে থাকতে আমি পারি না, কবি বলছেন ঃ

> আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন মৃত্যুরে
> লঙ্ঘিযা চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
> চিরকাল তবে সে কি থেমে যাবে শেষে
> কঙ্কালের সীমানায় এসে?
>
> —কঙ্কাল

না, থেমে যাবে না। রূপ থেকে সে অরূপে যাবে, দুঃখের বক্ষ ভেদ করে' আনন্দের সে সন্ধান পাবে। অনন্ত মৌনের বাণী শোনার অধিকার তার। দিনান্তজীবনের রহস্যতিমিরে জ্যোতিপথের সে পাবে ঠিকানা। সে, কেবল সে-ই, জানবে ঃ

> জ্যোতির্হীন সীমা
> মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
> যায় গলি,
> গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
> হয় সে অমৃতপাত্র সীমার ফুরালে অহংকার।
>
> — শেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূরবী ঃ জীবনসন্ধ্যা

পূরবী সন্ধ্যার রাগিনী ঃ দিনান্তের স্বপ্নসন্ধান এর আনন্দের ছন্দে। দিনের কর্মক্লান্তির অবসান হ'ল—সন্ধ্যার শান্তি নামবে এইবার। সূর্য বসেছে পাটে, প্রকাশলোক থেকে অপ্রকাশলোকে যাওয়ার তপস্যায় হচ্ছে মগ্ন। পূরবীর সুরে এই তপস্যার স্তব্ধতা।

কিন্তু বেদনা কি নেই? যেতে হবে বলে' যে-আর্তি, যে-সোহাগ, যে-ব্যাকুলতা—তা কি নেই এই সুরে? পৃথিবীকে যাবার আগে রাঙিয়ে যাবার নেই ব্যগ্রতা?

সন্ধ্যার শান্ত আকাশের 'ছবি'টির দিকে চেয়ে 'সূর্যাস্তের শেষ সমারোহে' একবারো কি মনে হয় না—যাবার বেলায় সূর্যদেব আলোছায়ার নানা রঙের খেলায় রাঙিয়ে দিচ্ছেন ধরিত্রীকে?

না, তা তো হয়, কিন্তু প্রশ্নও জাগে ঃ যেতেই যদি হবে, তবে এ-খেলা কেন?

ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোকচুম্বনে নীলজল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ ;......
স্বর্গ সুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে।

—ছবি।

মুছেই যদি দেবে তবে সন্ধ্যাকাশে এই ছবি আঁকাই বা কেন? না, প্রেম আছে যে। যাব অস্তাচলে, এটা সত্য, আবার প্রেম আছে বলে' আকাশ যে রাঙিয়ে-ও যাব, তা-ও সত্য। রঙের খেলা, সুখে দুঃখে ভাবে ভাবনায় 'রাগসক্ত' এই সব ছবি-আঁকার খেলা 'কালের প্রান্তরে মরীচিকা'র মত, তা জানি,—জীবনরবি অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সব মুছে যাবে, ঘুচে যাবে, তা-ও অজানা নয়—কিন্তু যাবে বলেই না প্রেমের বেদনায় অমৃতের সন্ধানে গান-গাওয়া?

> অস্ত যায় রবি;
> যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগসক্ত ছবি।
> তুই হেথা কবি,
> এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
> আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।
> —ছবি।

'মৃত্যুর নিশ্বাস'—কি না গতির অবশ্যম্ভাবিতা। গতির টানে সব চলে' যায়, সব মুছে যায়—নিয়ত সত্যের এই তত্ত্বজ্ঞান। সুরের মাধুর্যে এই তত্ত্বজ্ঞানকে জীবনানুগ করার দায়িত্ব হচ্ছে শিল্পের। শিল্পের আত্মপ্রাণ হ'ল প্রেম। প্রেমকে রূপায়িত করাই শিল্পের কার্য। প্রেমের যিনি কবি, তিনি কি এ কার্যটির ভার নেবেন না? গতির নির্মম সত্যটিতে মধুরের মন্ত্র বাজাবেন না গানের প্রেমে?

বাজাবেন। মৃত্যুর নিশ্বাসটিকে বাঁশিতে ভরে গানের আনন্দে তার অমৃতস্বরূপটি প্রকাশ করে দেবেন। অন্য কথায় 'গোধূলি-আলোটিরে' 'বাঁশির সুরে' দেবেন ভরে'। প্রার্থনা করবেন: জীবনসন্ধ্যায় যে-বেদনা ও চেতনার ভাবাবেগ আন্দোলিত হচ্ছে তাঁর অন্তরে, 'একটি সংগীতে' তা যেন প্রমুদিত হয়, প্রমুদিত হয় 'পূরবী'তে।

> সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই
> নিভৃত ক্ষণে আপন-মনে গাই।
> আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে,
> অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে—
> আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
> একটি সংগীতে
> —অবসান।

পূরবীর বক্তব্য অংশতঃ তাহ'লে বোঝা গেল, বোঝা গেল ঃ যাবার আর দেরি নেই বলেই রঙের লীলা, সুরের উৎসব ঃ

> অস্তরবি গোধূলিতে
> বলে গেল পূরবীতে
> আর তো অধিক নাই দেরি।
> রাঙা আলেকের জবা
> সাজিয়ে তুলেছে সভা
> সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরী।
> —বীণাহারা।

যাবার বেলায় 'যাব না' 'যেতে চাই না' বলে' হাহাকার করা এক কথা এবং যেতে-ই হবে জেনে' বেদনাবেগে পৃথিবীর আকাশকে রঙিন করে যাওয়া আর কথা। পূরবী-কাব্যে যে প্রত্যাবর্তনের প্রেম, তা তাই নৈরাশ্যের দ্যোতনা নয়, 'জীবন-উপভোগের করুণ ব্যর্থতা'ও নয়, তা জীবনগত সত্যের বেদন-সুন্দর উপলব্ধি, 'আসন্ন মৃত্যুর ভূমিকায়' প্রেম-সৌন্দর্যের বিচিত্র সমারোহ।

বেদনা আছে পূরবীতে, কিন্তু তা, বলাই বাহুল্য, 'সিনিক' বা পেসিমিষ্টিক'-দের বেদনা নয়, তা প্রেমকেন্দ্রিক হৃদয়বেদনার অপাবৃত শিল্পানন্দ, 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে' প্রেমকান্ত যে 'অপার বেদনা', পূরবী-কবির সেই বেদনা।' 'অসীমকালের' এ চিরন্তন 'দীর্ঘশ্বাস', 'যুগযুগান্তেব' হৃদয়ভার এর আস্বাদে। এর মাঝে 'চির প্রত্যাশার সুর বাজে ঃ 'আমি ভালোবাসি।' *

এই 'ভালোবাসির' বেদনা মোহ হয়ে-ও মোহ নয়, কেননা তা কবিকে বাঁধে না অর্থাৎ বেদনাবেগে কবি গতির অবশ্যম্ভাবিতাটি ভোলেন না, অস্বীকার করেন না। বেদনা আছে, আবার চেতনাটি-ও আছে, যে, প্রকাশ থেকে অপ্রকাশে যেতে-ই হবে, তা না হলে অপূর্ণ জীবনটুকুতে-ই থাকতে হবে সীমিত। দিনের জীবনে আজ-ও যা 'না-পাওয়া', সান্ত্বনার কথা এই ঃ দিনান্তের জীবনে তাকে 'পাওয়ার' মধ্যে পাব। তার আভাস পাচ্ছি ঃ

* দিনেন্দ্রনাথকে 'চিঠি', পূরবী, পৃঃ ১৯৬ দ্রষ্টব্য।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ার ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে—
মলিন আকাশ তলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারিগান গেয়ে।

—না-পাওয়া।

'সায়াহ্নের করুণ কিরণে' তার ডাক এল : দূরপথে, গৃহমন্দিরে 'পাওয়ার' পথে, এবার ফিরতে হবে।

সন্ধ্যাকালে দিকে দিকে ফেরার তৎপরতা। পাখী ফিরছে নীড়ে, মানুষ ফিরছে গৃহে। কবি-ও এবার গৃহে ফিরবেন। কিন্তু কেমন সে-গৃহ? পূরবী-কাব্যে সেই গৃহটি কেমন গৃহ?

না, একেবারে আদিগৃহ, আমাদের জীবনজন্মের আদি-উৎসভূমি, সর্বব্যাপী যে অখণ্ড শক্তি থেকে আমরা এসেছি, যেখান থেকে আসে রূপরসগন্ধস্পর্শগান, আসে এই সমস্ত গুণমাধুর্যের আস্বাদশক্তি, আসে প্রাণ, আসে ধ্যান, আসে চেতনা, আসে বেদনার বিচিত্র ভাবানুরাগ, রহস্যময় সেই অগমলোকের ইন্দ্রিয়াতীত মহাশক্তিই পূরবীকবির গন্তব্যগৃহ। সন্ধ্যা হ'ল, ফিরব সেই গৃহে।

'দিনের আড়ালে থেকে' সে-গৃহের সন্ধান পাই নি, দিনান্তের সিংহদ্বারে এসে সে-সন্ধান এবার শেষ হবে :

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে সন্ধান হোক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে, নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

—অন্ধকার।

বিশ্বলোক ও বিশ্বসুরের উৎসমুখে আমাকে নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমার আপন গৃহে, সেই আদিগৃহে।

দিনের আড়ালে থেকে তার রূপ দেখি নে, দেখতে পাই নে। তাই তা লোকভাষায় কিছু না, তা 'অন্ধকার'।

যে-সুন্দর চেতনস্বর্গ থেকে আমাদের আসা, এবং মর্ত্য-জন্মের কর্মশেষে নিঃশব্দ আনন্দে ফিরে-যাওয়া, সত্যসুন্দর সেই গুপ্ত-স্বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে-ই না অন্ধকার? কিন্তু কবি জানেন, 'উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন' তার আসন, তার-ই প্রাণকেন্দ্র থেকে বিশ্ব আলোর আবির্ভাব। সংসারে যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, সবের-ই উৎস সেই 'স্বপ্ন-উৎস'। সেই উৎসলোকে আজ ফিরতে যাই।

যাচ্ছি। কিন্তু কী নিয়ে যাচ্ছি? কী অর্ঘ্য দেব আমার গৃহদেবতাকে?

> দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
> তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
>
> —অন্ধকার।

'কীর্তির পুরস্কার' 'রত্ন অলংকার'—এ-সব তো কিছুই না। রাত্রির রহস্যমন্দিরে 'দিনের সংগ্রহের' মূল্য কতটুকু? দিনজীবনে সেগুলি হয়তো 'রত্ন' কিন্তু রাত্রির জীবনে সেগুলি তো 'বোঝা' মাত্র। 'সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে'। যা ম্লান হয়, 'মিছে' হয়, গতির জীবনে তার মূল্য তো কানাকড়ি-ও নয়।

তা তো বুঝলাম। তবে জীবনে কী-ই বা আছে, যা আমার রাত্রিজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেয়া যায়? কী এমন বস্তু আছে জীবনে, যা ম্লান হয় না, হয় নি, যা নিত্যনবীনা, নিত্যনবায়মানা?

জীবনপ্রভাতেই জীবনদেবতা আমার 'যাত্রাসহচরী'-র প্রেরণায় লাভ করেছিলাম প্রেমের আভাস, প্রেমের আনন্দ; সেই আনন্দের 'মাধবীমঞ্জরী'টি এখনো দেখি আছে 'অম্লান'। 'নিত্য নবীন' সেই অগমলোকের 'গোপন কক্ষ'

থেকে এ-মাধবীর জন্ম, 'দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে'— অগমলোকের রহস্য-মন্দিরে এটি-ই তবে যোগ্য অর্ঘ্য।

নিত্যনবায়মান প্রেম, দেবযান গতির আনন্দ এর অন্তরে, বৃহতে রতির দিব্যতা এর নয়নে, অজানার রহস্যময়তা এর রূপে রসে, বর্ণে গন্ধে ঃ

> হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে
> বুঝে-ও তখন বুঝি নি সে।
> তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
> তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
> কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
> আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
> আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
> তোমার আকাশে।
> —অন্ধকার।

মাধবীর গানে অগমের স্পর্শ। মাধবী প্রেম, প্রেমে তবে অগমের দ্যোতনা। তা এপারে, তা আনপারে। এপারে রূপপ্রেম, আনপারে অরূপপ্রেম। দিনজীবনে প্রেম 'রূপে রূপে প্রতিরূপে', রাত্রিজীবনে প্রেম 'বহিশ্চ'। প্রেম তবে সর্বজীবন গত, সর্বজগদ্‌গত গতিশ্চেতনা।

> প্রেমের এক দিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিচ্ছেদ আর-একদিকে মিলন ; একদিকে বন্ধন, আর-একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে। *

বিশ্বকে গ্রহণ-করা এবং অতিক্রম-করা একমাত্র সর্বানুভূ প্রেমের পক্ষেই সম্ভব। ইহজীবনে প্রেম যদি 'বৈচিত্র্যে' সুন্দর, পরজীবনে প্রেম তবে 'একে' নিত্যসত্য। সর্বময় এই অখণ্ড প্রেমকে খণ্ডজীবনে পাওয়া সম্ভব না, কিন্তু প্রেমের চরিত্র-ই এমন, যে, সীমিত রূপপ্রকাশের মধ্যে-ও তা অসীম সেই

* আত্মপরিচয়, পৃঃ ৭৮

অখণ্ড একের আভাস আনয়ন করে : প্রেমমাধবীর সৌগন্ধ্যে, তার রূপে, বর্ণে, নর্তনে দ্যোতিত হয় অখণ্ডের মহিমা।

অখণ্ডকে যে পেতে চাই, তার কারণটাই হ'ল এই। কিন্তু ঠিক বোধহয় বলা হ'ল না। কবি বলবেন, অখণ্ড পেতে নয়, অখণ্ড আমরা হতে চাই। হতে হতে চলেছি—লোকজীবনে তাই বেদনা, লোকোত্তর জীবনভাসে তাই চেতনা। লোকজীবনে কারুকে বা কিছুকে উপেক্ষা করি নে, কিন্তু কারুতে বা কিছুতে একান্তভাবে আসক্ত হয়ে থেমে পড়তে-ও চাই নে। থেমে যদি পড়ি, যথাসময়ে 'দিবসের অন্তিম প্রহর' এসে আসক্তির মোহজাল দেবে ছিন্ন করে'।

থেমে পড়তে চাই নে—অন্তিম প্রহরের মধুররস আস্বাদ করেছি অন্তরে, আমি যাচ্ছি, আমি যাব। 'শেষ অর্ঘ্য' দেব তাকে, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করব সমাধা।

'শেষ অর্ঘ্য' নামক চতুর্দশপদী কবিতাটির এই ধ্বনি।

যে-তারা 'নিশান্তের বাণী' শুনিয়ে একদা আমাকে 'নিখিলের আনন্দমেলায়' ডেকে নিয়ে এল, স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল 'দিনের খেলায়', যে সুন্দরী চকিতে আমার জীবনে এসে তন্দ্রা আমার দিল দূর করে, জীবন-চেতনায় জাগাল জ্যোতির সম্মোহ, সেই আমার প্রেমস্বরূপা মহীয়সী তারা—দিনের আড়ালে থেকে ভুলে ছিলাম তাকে। দিনান্তে তাকে খুঁজতে চললাম পূজার উদ্দেশ্যে।

> এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
> সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

কী অর্ঘ্য তাকে দিতে পারি? পৃথিবীতে কী এমন মহান সম্পদ আছে যাতে তার মহিমা থাকে অক্ষুণ্ণ? না, আছে তো অশ্রুর অর্ঘ্য যা মর্ত্যলোকে স্বর্গের কণিকা। যে-জীবন ভোগ করলাম, যার করুণায় করলাম, জীবনসন্ধ্যায় তার উদ্দেশ্যে আমার আজন্ম-সঞ্চিত প্রেমাশ্রু, কৃতজ্ঞতার, নম্রতার, প্রসন্নতার বেদনাশ্রু, যা তারকার মত জ্বলজ্বলে, যা হৃদয়াবেগের অমিত দীপ্তির মত

দিব্যতার মহিমায় টলটলে—'মাধবীমঞ্জরী'র অর্ঘ্যের মত তাই রাখব তার পায়ে।

'অবসান' কবিতাটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করুন ঃ

'দিনের শেষে' যে ফুলটি ঝরে গেল, তার 'শেষ নিশ্বাসের' সর্বহারা করুণ-বিহ্বলতা-ই কি পূরবীর সুর ? নবজন্মের স্বপ্ন কি নেই সেই সুরে? দিন শেষ হ'ল, রাতে যে তারা উঠবে নবীনের ঔজ্জ্বল্যে, তার মহিমার সুর কি পূরবী নয় ?

জীবনসন্ধ্যার বাণীটি কি ?

সন্ধ্যা মম কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব—
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে।
অথবা বসে বাঁধিব সুর যে তারা ওঠে রাতে।
তাহারি মহিমাতে।

না, দুটি সুরের অদ্বয় আনন্দ-ই গাইব। সন্ধ্যার বাণী যে তাই-ই। যাওয়ার বাণী, জাগার বাণী—দুই বাণীব অখণ্ড প্রেরণার নাম পূরবী। 'যে-ফুল না ফুটিতে ঝবেছে ধরণীতে' তার শেষ নিশ্বাস গাইব, কিন্তু তা যে 'হারা' হয় নি, দিনান্তের মহাকাশে তারার দীপ্তিতে ফুটে আছে অমৃতের আনন্দে— এ-বিশ্বাস-ও গাইব।

সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব, যত হারাণো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।
—অবসান।

শেষ দুই পংক্তির নানা অর্থ হতে পারে। ইহলোক থেকে যারা চলে গেছে, যত বাণী, যত সুর, যত কথা গেছে 'অন্ধকারে' তোমার অগম রজনীতে, সন্ধ্যায় যাব সেই সব মহাবিত্তের অন্বেষণে।

কিংবা—

অশেষ থেকে বিশেষ এই মর্ত্যজন্মে আসার ফলে কত বাণী, কত সুর হারিয়ে এসেছি, ফেলে এসেছি তোমার রজনীতে। আজ যে আমি অপূর্ণ, তার কারণ নাকি এই? অনন্তে অনন্ত ছিলাম, সান্ত হয়ে অনন্তের বাণী হারিয়েছি। ভাগ্য ভালো সন্ধ্যা এল, হারিয়ে-যাওয়া-বাণীর সন্ধানে এবার ফিরব।

কিন্তু এখনি তো ফিরে যাই নি, ডুবে যাই নি অরূপের রসলোকে। তার আভাসটুকু মাত্র পাচ্ছি। এখনি যদি সেই 'ও পারের গান' গাইতে বলো, পূর্ণভাবে তা পারব কেন?

এ পারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি
'ও পারের গান গাও দেখি।'
—বীণাহারা।

তা ও-পারের গান যে-যন্ত্রে বাজাব' সে-যন্ত্র তো জন্মের আগেই এসেছি ফেলে। দিনজীবনে যে-বীণা বাজাই, যে—'বসন্তবাহাব' বাজাই, দিনান্তজীবনে সে-বীণা, সে-সুর তো কাজের নয়। ওপারের গান বাজাতে হলে ও-পারের সেই বীণাটি যে দরকার। 'মিলনের বার' এল, অধিক আব দেরি নাই, জানলাম, কিন্তু শুভ এই সংবাদে যে-আনন্দ, যে-রসাবেশ, তা বাজাব কী করে, বাজাব কোন্ যন্ত্রে?

এল বুঝি মিলনের বার,
আকাশ ভরিল ওই,
শুধাইলে 'সুর কই'
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীণকার।
—বীণাহারা।

তাৎপর্য এই: বীণাটি পেতে হবে, আর বিলম্ব নয়, এবার যাব। গৃহে ফিরব: সংসার-গৃহ থেকে সরতে সরতে, জীবনসন্ধ্যায়, সেই আদিগৃহে।

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তোমার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো; যেথা হতে নামে পৃথ্বী পরে
শ্রাবনের সায়াহ্ন যুথিকা;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।
—ক্ষণিকা।

আদিগৃহ সেই অনন্ত অগম আকাশ, বিশ্বরূপবৈচিত্র্যের প্রকাশ সেই আকাশ থেকেই। আমি-ও তা থেকে রূপলোকে হয়েছি সমায়াত। এসেছি সেখান থেকে, যাব সেখানেই। এখান থেকে এতকাল যা-কিছু গেছে, কিছুই তার হারায় নি, সব আছে সেই অমৃতের আদিগৃহে। যেতে হবেই বলে' নয়, হারাণো ধনগুলি ফিরে পাব বলে-ও যাব।

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রানীর স্বয়ম্বরবরমাল্য সাথে।...
—যাত্রা।

এই আদিগৃহে অভিযাত্রার কল্পনাটি বড় মধুর, বড় সান্ত্বনাময়। পূরবী তাহ'লে রিক্ততার সুর নয়, তা পূর্ণতার, তা প্রশান্তির। বিগত জীবনের সুখ ও ভোগানন্দকে পুনর্বার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খায় কবি সংসার-গৃহে, 'কান্নাহাসিগঙ্গাযমুনা'র তীরে, প্রত্যাবর্ত্তন করছেন, অথচ মৃত্যু আসন্ন বলে' জীবনোপভোগে ব্যর্থতা আসছে, আনন্দ হচ্ছে ম্লান:—পূরবী পাঠে এ-ধারণা যাঁদের

হয়েছে, কবির প্রতি তাঁরা সুবিচার করেছেন বলে' আমার মনে হয় নি। * 'অনন্ত অসীমের নেশা' ত্যাগ করে' সংসার-গৃহে-ই কবি ফিরে এলেন, 'যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি' ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা তাঁর প্রবল হ'ল, এবং 'ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে' ঠাঁই খুঁজে নেয়ার প্রেরণাতেই সৃষ্টি হ'ল পূরবীর,— এ-ধারণা-ও খুব সূক্ষ্মবিচারবোধপ্রসূত বলে' আমার মনে হয় নি। †

পূরবীতে প্রত্যাবর্তনের সুর-ই বেজেছে—এটা সত্য। মৃত্যুর তত্ত্বটি উপলব্ধ হলে বোঝা সম্ভব—ঘরে নয় পথে, পথে নয় অনন্ত-মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের আনন্দবার্তা-ই পূরবীর প্রতিপাদ্য। সংসারগৃহের জন্য আর্তি, সোহাগ ও ব্যাকুলতা এ-কাব্যে অবশ্য-ই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সহজ কথাটা কেন বুঝিয়ে বলতে হবে, যে পুনর্বার পিছু-হটা তার তাৎপর্য নয়, দূরলোকে প্রত্যাবর্তনের পথে আর্তিভরে সংসারকে, সন্ধ্যাকাশে সূর্যের মত, রাঙিয়ে-যাওয়া-ই জাগিয়ে-যাওয়া-ই তার তাৎপর্য! একাধিকবার বলেছি, প্রেম আছে বলে' এটা হতে-ই হবে। বৈচিত্র্য কবিহৃদয়ের উপলক্ষ্য, লক্ষ্য তার এক অখণ্ড, সমস্ত বৈচিত্র্যের-ই যা মূলাধার। বৈচিত্র্যের বেদনা শিল্পের প্রেরণায়, একের সন্ধান তত্ত্বের আনন্দে। প্রেমসাধনায়, আবার কি বলব, দুই-ই চাই? একে যাচ্ছি কিন্তু যেতে যেতে-ও ঘরের জগৎকে রাঙাতে চাচ্ছি। স্মৃতি, স্বপ্ন, ভাবনাবেদনা— রাঙাতে-চাওয়ার এ-সমস্ত উপকরণ মাত্র। ছবি আঁকতে যেমন ক্যানভাস চাই, রঙ চাই, তুলি চাই, বর্তমানের ক্যানভাসে তেমনি স্মৃতির রঙ দিয়ে, স্বপ্নের তুলি দিয়ে ভাবনাবেদনার ছবি আঁকতে চাই মনের আকাশে। জানি, আকাশে নানা রঙ, নানা ছবি, কিন্তু কোনোটাই নয় চিরন্তন। চিরন্তন সত্য এই: সব মুছে যায়, যায় সেই অনন্তে: যেতে যেতে আমরা-ও তাই আঁকি আর আঁকতে আঁকতে যাই।

অনন্তমন্দিরে আমরা যাই—পূরবীতে এই যাওয়ার সুর। সন্ধ্যা এসে সেই যাওয়ার কথা জানাল, মৃত্যু এসে তা' সত্যে প্রতিভাত করবে। এটা কি ভয়ের কথা? না।

* অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমা, পৃঃ ৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।
† ডঃ নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা পৃঃ ৩২৮-৩০ দ্রষ্টব্য।

ভয় নাই, ভয় নাই
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হ'ল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।
—পদধ্বনি।

মৃত্যু তবে ভয়ের ব্যাপার কিছু নয়। জীবনে যদি আনন্দের, মৃত্যু-ও তবে তাই। প্রভাত যদি বরণীয়, সন্ধ্যা-ও তবে স্মরণীয়। যদি নয়, তবে বুঝতে হবে দিনসর্বস্ব আমাদের জ্ঞান, সীমাসর্বস্ব আমাদের তত্ত্ববোধ ঃ দিন ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব, রাত্রিতত্ত্ব যে আছে এই প্রকৃতিজীবনে, এটা আমরা মনে করি না। তবে কি বুঝিয়েই বলতে হবে, প্রকৃতিতে শুধু দিন কি শুধু রাত্রি সত্য নয়, দিন-ও রাত্রির একত্র সম্মেলনেই তার অস্তিত্ব, তার স্ফূর্তি, তার বিলাস? দিন জীবনের শেষে যদি ভয়ার্ততা তবে বুঝতে হয় অর্ধ-জীবন নিয়েই আমাদের তৃপ্তি, বাকি অর্ধ যে পাওয়া হ'ল না—সে বিষয়ে নেই ঔৎসুক্য।

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি মোহ থেকেই মৃত্যুভয়। মৃত্যুতে যদি ভয়, তবে বর্তমানের প্রাপ্তিটুকুতে হয় লোলুপের মত আসক্ত—নয় আশাহতের মত নিশ্চেতন। চলমান জীবনে এই দুই অবস্থা-ই 'আনরিয়াল'। রাত্রির রহস্যা-বিষ্কারে জীবন তাই ছোটে, দুর্গমের অভিযাত্রী হওয়ায় তার আনন্দ। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে অহরহ তাকে চলতে হয়। চলার বেগে দুপাশে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের প্রেম প্রেরণার শান্তিজলে 'ঘট' ভরে' নিতে হয় সত্য, কিন্তু 'বিদায়-'ও নিতে হয়।

যারা স্নেহে, সৌজন্যে, সখ্যে, সেবায় আমার জীবন জাগাল তাদের উপেক্ষা

হয়েছে, কবির প্রতি তাঁরা সুবিচার করেছেন বলে' আমার মনে হয় নি। *
'অনন্ত অসীমের নেশা' ত্যাগ করে' সংসার-গৃহে-ই কবি ফিরে এলেন, 'যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি' ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা তাঁর প্রবল হ'ল, এবং 'ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে' ঠাঁই খুঁজে নেয়ার প্রেরণাতেই সৃষ্টি হ'ল পূরবীর,— এ-ধারণা-ও খুব সুক্ষ্মবিচারবোধপ্রসূত বলে' আমার মনে হয় নি। †

পূরবীতে প্রত্যাবর্তনের সুর-ই বেজেছে—এটা সত্য। মৃত্যুর তত্ত্বটি উপলব্ধ হলে বোঝা সম্ভব—ঘরে নয় পথে, পথে নয় অনন্ত-মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের আনন্দবার্তা-ই পূরবীর প্রতিপাদ্য। সংসারগৃহের জন্য আর্তি, সোহাগ ও ব্যাকুলতা এ-কাব্যে অবশ্য-ই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সহজ কথাটা কেন বুঝিয়ে বলতে হবে, যে পুনর্বার পিছু-হটা তার তাৎপর্য নয়, দূরলোকে প্রত্যাবর্তনের পথে আর্তিভরে সংসারকে, সন্ধ্যাকাশে সূর্যের মত, বাঙিয়ে-যাওয়া-ই জাগিয়ে-যাওয়া-ই তার তাৎপর্য! একাধিকবার বলেছি, প্রেম আছে বলে' এটা হতে-ই হবে। বৈচিত্র্য কবিহৃদয়ের উপলক্ষ্য, লক্ষ্য তার এক অখণ্ড, সমস্ত বৈচিত্র্যের-ই যা মূলাধাব। বৈচিত্র্যের বেদনা শিল্পের প্রেরণায়, একের সন্ধান তত্ত্বের আনন্দে। প্রেমসাধনায়, আবার কি বলব, দুই-ই চাই? একে যাচ্ছি কিন্তু যেতে যেতে-ও ঘরের জগৎকে রাঙাতে চাচ্ছি। স্মৃতি, স্বপ্ন, ভাবনাবেদনা— রাঙাতে-চাওয়ার এ-সমস্ত উপকরণ মাত্র। ছবি আঁকতে যেমন ক্যানভাস চাই, রঙ চাই, তুলি চাই, বর্তমানের ক্যানভাসে তেমনি স্মৃতির রঙ দিয়ে, স্বপ্নের তুলি দিয়ে ভাবনাবেদনার ছবি আঁকতে চাই মনের আকাশে। জানি, আকাশে নানা রঙ, নানা ছবি, কিন্তু কোনোটাই নয় চিরন্তন। চিরন্তন সত্য এই: সব মুছে যায়, যায় সেই অনন্তে: যেতে যেতে আমরা-ও তাই আঁকি আর আঁকতে আঁকতে যাই।

অনন্তমন্দিরে আমরা যাই—পূরবীতে এই যাওয়ার সুর। সন্ধ্যা এসে সেই যাওয়ার কথা জানাল, মৃত্যু এসে তা' সত্যে প্রতিভাত করবে। এটা কি ভয়ের কথা? না।

* অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমা, পৃঃ ৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।
† ডঃ নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা পৃঃ ৩২৮-৩০ দ্রষ্টব্য।

ভয় নাই, ভয় নাই
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হ'ল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।
—পদধ্বনি।

মৃত্যু তবে ভয়ের ব্যাপার কিছু নয়। জীবনে যদি আনন্দের, মৃত্যু-ও তবে তাই। প্রভাত যদি বরণীয়, সন্ধ্যা-ও তবে স্মরণীয়। যদি নয়, তবে বুঝতে হবে দিনসর্বস্ব আমাদের জ্ঞান, সীমাসর্বস্ব আমাদের তত্ত্ববোধঃ দিন ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব, রাত্রিতত্ত্ব যে আছে এই প্রকৃতিজীবনে, এটা আমরা মনে করি না। তবে কি বুঝিয়েই বলতে হবে, প্রকৃতিতে শুধু দিন কি শুধু রাত্রি সত্য নয়, দিন-ও রাত্রির একত্র সম্মেলনেই তার অস্তিত্ব, তার স্ফূর্তি, তার বিলাস? দিন জীবনের শেষে যদি ভয়ার্ততা তবে বুঝতে হয় অর্ধ-জীবন নিয়েই আমাদের তৃপ্তি, বাকি অর্ধ যে পাওয়া হ'ল না—সে বিষয়ে নেই ঔৎসুক্য।

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি মোহ থেকেই মৃত্যুভয়। মৃত্যুতে যদি ভয়, তবে বর্তমানের প্রাপ্তিটুকুতে হয় লোলুপের মত আসক্ত—নয় আশাহতের মত নিশ্চেতন। চলমান জীবনে এই দুই অবস্থা-ই 'আনরিয়াল'। রাত্রির রহস্যা-বিষ্কারে জীবন তাই ছোটে, দুর্গমের অভিযাত্রী হওয়ায় তার আনন্দ। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে অহরহ তাকে চলতে হয়। চলার বেগে দুপাশে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের প্রেম প্রেরণার শান্তিজলে 'ঘট' ভরে' নিতে হয় সত্য, কিন্তু 'বিদায়-'ও নিতে হয়।

যারা স্নেহে, সৌজন্যে, সখ্যে, সেবায় আমার জীবন জাগাল তাদের উপেক্ষা

করব, বন্ধন বলে' ত্যাগ করব, এটা প্রেমের কথা নয়। কিন্তু প্রেম যেহেতু প্রেম, মোহ নয়, তাদের টানে চিরকাল বদ্ধ ও পারি না থাকতে। তারা-ও পারে না, চলে যায়, কেউ আগে, কেউ পরে। যখন যায়, আঁত-ফাটা আর্তনাদে আকাশ ফেলি ফাটিয়ে, কিন্তু কালের আশীর্বাদে ক্রমশঃ বুঝতে পারি শোকার্ততার মোহে চিরকাল বন্দী থাকে না চলমান মন। শোক থেকে অশোকে, হারাণোর বেদনা থেকে পাওয়ার চেতনায় পথ সে করে-ই কয়ে। তখন ঃ

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়
ফুরায় নি তো ফুরাবার এই ভান।
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
—শীত।

'ফিরে আসা' মানে নবীন হয়ে আসা। এই নবীন হওয়ার রহস্যটি যাঁর চেতনাকে স্পর্শ করেছে, তিনি-ই বুঝবেন পূরবীতে বন্ধন ছেদনের যে বাণী আছে তার তাৎপর্য কী ঃ

যায় যাক, যায় যাক আহুক দূরের ডাক
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন
চলার সংঘাতবেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়নন্দন।
— উৎসবের দিন।

মোহবন্ধন ছিন্ন হ'ক, লোকোত্তর সংগীত জাগুক গতির আনন্দে। কিন্তু কথাটি তো খুব সহজ হ'ল না। মনের কথাটি কবি সহজ করলেন 'আগমনী' কবিতায় ঃ

বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে
বাহিরে পাস ছুটি
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি।

স্তবকটি এমনি যে, পাঠমাত্র মনে হয় যেন বুঝেছি। মন তাতে তৃপ্ত-ই হয়। একটা যা হয় কিছু আস্বাদ করে। এইজন্যে এটি সহজ। আসলে নিগূঢ়ার্থে এটি সহজ নয় মোটেই। পূরবীর ভাবতত্ত্ব তথা রবীন্দ্রজীবনধর্মের গভীর তত্ত্ব এটির মধ্যে নিহিত আছেঃ মোহ-বাঁধন দূরে যাক, প্রেয়জীবনের বাহ্য সুখভোগ ও তৃষ্ণা থেকে শ্রেয়জীবনে পাই মুক্তি। সমস্ত বিপরীতের বিরোধ থেকে পাই মুক্তি।

সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপর মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম-বোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃত লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। *

অদ্বৈতপ্রেমে উত্তীর্ণ হওয়ার বার্তা আনল যে জীবনসন্ধ্যা, পূরবী সেই জীবন-সন্ধ্যার আনন্দ। আনন্দ এইজন্য, যে, সন্ধ্যা সন্ধ্যাতেই শেষ নয়, আসবে নবতর

* আত্মপরিচয়, পৃঃ ৭৬-৭৭

প্রভাত। পূরবী তাই সন্ধ্যার শুধু নয়, মৃত্যুর হয়েও শুধু মৃত্যুব নয়, তা প্রভাতেরো, নবজন্মেরো ব্যঞ্জনা।

সন্ধ্যা হ'ল, সুখের দিন গত হ'ল—এই-ই যদি পূরবীর সুর, তবে পূরবীতে 'যৌবনের লুপ্তদিনের' জন্য লোলুপতা, বার্থতা।

সন্ধ্যা এল, আসবে রাত্রি—তার মধ্যে থেকে আহরণ করব আমার গোপন ধন, আহরণ করব নবতর প্রভাতরবির রক্তিমাভা, জন্ম নেব সেই রক্তিমাভার অপ্রাবৃত সৌন্দর্যে, এই যদি পূরবীর ধ্যান, তবে পূরবীতে সূর্যসন্ধানের আনন্দ, নিত্য গতির রহস্য।

'বলাকা'-কাব্যে-ও এই নিত্যগতির রহস্য। তবে পূরবী-গতির সঙ্গে বলাকা-গতির মর্মগত ঐক্য থাকলে-ও রূপগত কিছু পার্থক্য আছে। বলাকাগতির রূপটি যৌবনের রূপ ; যৌবনতরঙ্গোচ্ছ্বাসে দুর্বার তার প্রাণসত্তা। সে-প্রাণ সকল কিছু মোহ, সকল প্রকার বন্ধন, সকল রকমের সংশয় ভেদ করে' অহরহ এগিয়ে চলে। কিন্তু কোথায় চলে? 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত' সন্ধানে সে চলে। কিন্তু বলাই বোধ হয় বাহুল্য, বলাকায় 'গন্তব্য'টি অর্থাৎ অমৃতানন্দের ধ্রুবস্বর্গটি, সত্য হলে-ও গন্তব্য-অভিমুখে গতির ছন্দটাই প্রাধান্য পেয়েছে। অপর পক্ষে পূরবীতে-ও 'গতি' সত্য কিন্তু বক্তব্য তার গতি নয়, গন্তব্য, অর্থাৎ অগম সেই অমৃত অন্ধকার, যা থেকে উৎসারিত রূপময় এই সূর্যজগৎ। পূরবী-গতি তাই বলকা-গতির মত অত দুরন্ত নয়, বড় শান্ত। পূরবীগতির রূপটি, আমার মনে হয়েছে, প্রাবীণ্যের রূপ। বলাকা যদি যৌবন, পূরবী তবে প্রাবীণ্য। বলাকা যদি ব্যাপ্তির পুলকোচ্ছ্বাস, পূরবী তবে গভীরতার প্রশান্তি।

বলাকা-কাব্যে গতি-প্রসঙ্গে মৃত্যুর কথা বারংবার বলা হয়েছে। বস্তুতঃ মৃত্যুই যে গতির প্রাণ, এ-কথা-ও স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু রসিকের কাছে এ-তথ্য অবশ্যই নূতন নয়, যে বলাকার মৃত্যু এবং পূরবীর মৃত্যু রূপবিচারে এক বস্তু নয়। বলাকায় মৃত্যু নায়ক নয়, জীবন-ই নায়ক ; সে-ই-ই মৃত্যুকে সঙ্গের সাথী করে' বিপুলবেগে চলেছে এগিয়ে। পূরবীতে জীবন যেন নায়ক নয়,

মৃত্যু-ই নায়ক, জীবনকে পরম মিত্রের মত আলিঙ্গন দিয়ে অমৃতলোকে চলেছে ধীর পাদবিক্ষেপে। এইজন্যে বলাকা যদি গতির কাব্য, পূরবী তবে চলে-যাওয়ার কাব্য। তত্ত্ব হিসাবে এ দুটি এক-ই বস্তু, রূপভেদে পৃথকত্ব স্পষ্ট হচ্ছে। রূপ ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে বলাকাকে, পণ্ডিতেরা যদি সাহস দেন তো, বলি বীররসের কাব্য আর পূরবীকে, করুণরসের। ঠোঁট উল্টে অর্বাচীনের অতিমূঢ় এই মন্তব্যের অভিমুখে উন্নাসিক-ও যদি হন, তবে ভয়ে ভয়ে মন্তব্যটা প্রত্যাহার করব, জনান্তিকে বলব, ওটি তবে জীবনরসের, আর এটি মৃত্যুরসের মহান কাব্য। এ-মন্তব্যটি-ও যদি মনে না ধরে, ধমক খাব জানি, আমতা-আমতা করে' তখন জানাব—বলাকা-কে আমার মনে হয়, প্রভাতের শক্তিগরিমায় সন্ধ্যা-সঙ্গীত, আর পূরবী, সন্ধ্যার প্রেমমহিমায় প্রভাত-সঙ্গীত!

তৃতীয় অধ্যায়

সন্ধ্যা ঃ জীবনপ্রভাত

সন্ধ্যার তত্ত্বতাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধ হলেই 'পূরবীর' মর্ম-ঝংকারে প্রভাতী-সুরটি শোনা সম্ভব্ হবে। সন্ধ্যার অন্তরে নিগূঢ় রাত্রি, রাত্রির অন্তর্লোকে সুন্দর অন্ধকার। অন্ধকার সেই সুন্দরের আহ্বানেই তো প্রমুদিত হয় রূপের জগৎ, প্রেমের কমল।

প্রেমের কমল যদি প্রমুদিত হল, তবে তো প্রভাত হল। প্রভাতী-সুরে যে-আনন্দ, 'রজনীর' তিমির বাঁধ' ভাঙ্‌ল সেই আনন্দেব তরঙ্গে। 'বাতাসে বাতাসে ব্যাপ্ত হ'ল কমলের সৌরভ, কালো ভ্রমর এবার এল বলে'। কালো এসে মিলিত হবে, তবেই তো কমলজীবনের পূর্ণতা। যার জন্যে কমলের প্রকাশ, তার প্রতীক্ষাতেই না পূর্ণতার সন্ধান?

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয় কমল টুটিটা সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।
—প্রভাতী।

কালো ভ্রমর, কি না নিগূঢ় সেই অপার অন্ধকার। অন্ধকারের বিরাটত্ব, তার ব্যাপ্তি ও গভীরত্ব, তার সীমাহীন অশেষসত্তার অপাবৃত মুক্তি-প্রশান্তি—অন্তরের গভীরে আস্বাদ করতে পারছি, কবি বলছেন।

এই আস্বাদ-ই তো প্রভাতরসের আস্বাদ।

মোর রজনীর ভেঙেছে তিমিরবাঁধ,
পাও নি কি সংবাদ।
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে বারতা।
শোন নি কী গাহে পাখী,
হে কালো কাজল আঁখি।
—প্রভাতী।

'জেগে-ওঠা প্রাণে'র গান গাইছে পাখী, গান গাইছে নবোদ্বেজিত প্রেমের। গাইছে নবতর প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যামহিমায় প্রভাতসঙ্গীত: কালোমহিমায় আলোর গান।

জীবনের নবপ্রভাত তবে এল।

দিকে দিকে তাই প্রকাশের পালা। কেউ আর কিছু বাকি রাখবে না, সব কিছুই প্রকাশ করবে:

শিশিরশিহরা পল্লব ঝলমল
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল—
কিছু না রহিল বাকি।
—প্রভাতী।

জীবনের পক্ষে-ও এ-সত্য প্রযোজ্য। প্রভাত এল তো সব দিয়ে নিঃস্ব হওয়ার অমৃত যোগ এল:

এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা
খেলিব এবার সব-হারাণোর খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি
হে কালো কাজল আঁখি।
—প্রভাতী।

প্রেমে সব সমর্পণ করব, সব-হারাবার খেলা খেলব, কিছু বাকি রাখব না। জীবনে যা কিছু বাকি রাখি, সেই বাকিটুকুর লোভে ও ভোগে সীমিত হয়ে

যাই, বদ্ধ হয়ে যাই গোপনে। যেই সীমিত-থাকা বদ্ধ-থাকা তো আচ্ছন্নতা, তা কি প্রভাত? প্রভাতের বাণী তো মোহাচ্ছন্নতা নয়, তা' প্রকাশ, দিকে দিকে লোকে লোকে সর্বব্যাপী প্রেমের নিবেদিতপ্রাণতায় সুপ্রকাশ।

এই প্রকাশের বাণী কি 'মাটির ডাকে'?

'মাটির ডাক' কবিতাটির কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে প্রচলিত সাধারণ ধারণাটাই প্রথমে মেনে নিচ্ছি: জীবন-সায়াহ্নে কবি প্রকৃতির কোলে রসভোগে পুনর্বার প্রত্যাগত হলেন, এই সাধারণ সহজ অর্থটাই প্রথমে গ্রহণ করছি। দেখা যাক, কোথায় তারপর গিয়ে দাঁড়াই।

কবি বলছেন, 'যে-জননীর কোলের পরে মর্তঘরে' মানুষের জন্ম, আধুনিক সভ্যযুগে, সেই কোলে ফিরতে মানুষ তেমন আর আগ্রহ প্রকাশ করে না। সেই কোল যেন হারিয়ে-ই গেছে। আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমানদের সমাজে 'হারানো কোল' খুঁজে পাওয়া আজ দায়-ও বটে। 'ইঁটকাঠের পুরে বেড়াঘেরা বিষম নির্বাসনে' মানবসমাজ আজ বন্দী,প্রাণে তাদের নেই তৃপ্তি, নেই শান্তি, দ্বেষবিদ্বেষ এবং নিত্য অসন্তোষে তারা অশান্ত, যন্ত্র-জাঁতার নিষ্পেষণে হৃদয় তাদের নিষ্পিষ্ট। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজেকে নিয়ে মুক্তির মর্যাদায় যে বসব সে উপায় আজ আর নেই। নেই বলেই কি প্রত্যাবর্তনের এই আবেগোচ্ছ্বাস:

> যাই ফিরে যাই মাটির বুকে;
> যাই চলে যাই মুক্তিসুখে
> ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে?

কর্মকোলাহলের বিচিত্র বস্তুগতির উচ্ছ্বাসে বহুদূর গেছলাম চলে, মাটিকে, আমার জন্মভূমিকে, উৎসভূমিকে, ভুলে ছিলাম ব্যগ্র সেই গতির প্রাবল্যে, আজ জীবনসন্ধ্যায় ফিরে এলাম মাটির অঞ্চলে, 'মা আমাকে নাও' বললাম কেঁদে—এমনতর একটা প্রত্যাবর্তনের বেদনোচ্ছ্বাস কবিতাটিতে খুঁজে বার করা অসম্ভব না। এ-ব্যাখ্যাটি আমার সহমর্মীদের গ্রহণযোগ্য বলেই যদি মনে হয়, তবে—যৌবনের লুপ্ত রসপিপাসার মোহাবেশে প্রকৃতিরূপে বৃদ্ধকবি পুনর্বার হারানো-দিনগুলি আস্বাদ করতে ফিরলেন—এটা বলব না, বলব—অস্তায়মান সূর্য যেমন

সন্ধ্যারাগের রক্তিমাভা শেষবারের মত দান করে পৃথিবীতে, জীবনসায়াহ্নে কবি মাটির কোলে তেমনি প্রেমানুরাগের শান্ত রশ্মি বিকিরণ করতে ফিরলেন। এমন ব্যাখ্যায়, বলাই বাহুল্য প্রকাশতত্ত্বের আনন্দটি মেলে।

কিন্তু এ-ও বোধ হয় 'মাটির ডাকের' বক্তব্য নয়। ফিরে-আসার দীপ্তোচ্ছ্বাসের ইন্দ্রজালে এগিয়ে-চলার স্বপ্নানন্দটি কবি সংগুপ্ত রেখেছেন বলেই আমার ধারণা। এ-কবিতায় বাচ্যার্থে যৌবনবেগ, লক্ষণার্থে জীবনসায়াহ্নের রূপরাগ, ব্যঞ্জনার্থে দূরপথযাত্রার সুরোল্লাস।

মাটিতে আমার জন্ম, মাটিতেই পুনর্বার শুতে এলাম—এ-ও কি নয় মাটির ডাকের ধ্বনি? বস্তু-বিভোর মোহচাঞ্চল্যে শোয়ার কথা মনে ছিল না, গেছলাম কোল ছেড়ে বহুদূরে, চেতনা যখন হল, ফিরে পেলাম সেই হারানো কোল, কোল পেলাম তো সব-ই পেলাম?

সহজ কথাটি এই: বস্তুপৃথিবীতে জন্ম যখন হয়, তখন অশেষ সেই ভুবন থেকে বিশেষরূপটি নিয়ে বিশেষ ব্যস্ততায় নানাবিশেষের অন্বেষণে দিনজীবনটুকু আমরা কাটাই। বিশেষ কর্মে, বিশেষ ধর্মে, বিশেষ আশায়, বিশেষ নৈরাশ্যে সারাটা দিন ফুরিয়ে এলে আসে সন্ধ্যা, পূরবীর সুর বাজে আকাশে, রঙের রমণীয়তায় স্বপ্নোজ্জ্বল হয়ে ওঠে পশ্চিম দিগন্ত, মাটির ডাকে তখন সন্ধ্যারাগের নূতনবার্তা অভয়বার্তা শুনি। তরুণবয়সের স্বপ্নে 'বসুন্ধরার' যে অখণ্ড রূপ দেখেছি ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতিরূপে নব নব সৌন্দর্য দর্শনে যে-ভাবাবেগ করেছি অনুভব, আজ মনে হয়, সে-সমস্তের 'নিমন্ত্রণে' আমার চিরন্তন 'প্রাণের আছে দাবি'। যে-উৎসভূমি থেকে, এই সব রূপবৈচিত্র্যের আবির্ভাব, সেই 'যজ্ঞশালা'র চাবির সন্ধানে মাটির কোলে আবার তাই ফিরতে হবে।

মাটি থেকে এসেছি, তার-ই 'অঙ্ক মাঝে' 'প্রভাতরবির' বেজেছে শুভ'শঙ্খ', আবার 'শান্তমনে ক্লান্তদিনের শেষে' মা-টিকেই ফিরে ফিরে চাইতে হবে, 'পূজার কালে' জ্বালতে হবে 'সন্ধ্যারতির প্রদীপ'।...জীবনে প্রভাতের মত সন্ধ্যা-ও সত্য, সন্ধ্যার মত প্রভাত-ও সত্য। যা সত্য, প্রসন্ন মনে তা গ্রহণ করতে পারলেই বোঝা যাবে— তা মঙ্গল তো বটে-ই, সুন্দর-ও বটে। 'মৃত্যুর আহ্বান'

যদি সত্য, 'মাটির ডাক' তবে সুন্দর। সত্যের প্রকাশতত্ত্বটি কবিতার সুন্দরশিল্পে প্রমুদিত হয়েছে বলেই মাটির ডাক সুন্দর। একটু ধীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করলেই দেখা যায়—মানবিক ভাবাবেগের অমিত আনন্দে, সর্বোপরি নবতর রূপকল্পের ঐন্দ্রজালিক মায়ারচনার · নৈপুণ্যে—জীবনের নিষ্ঠুর তত্ত্বসত্যটি এ-কবিতায় একেবারে সংগুপ্ত রাখা হয়েছে।

তত্ত্ব এই ঃ মাটি থেকে এসেছি, মাটিতে আবার ফিরব ঃ

বাঁধন-ছেড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।

এই 'আপন মাকে' চাওয়া মানে-ই বিশ্ববৈচিত্র্যের জন্মদাত্রী সর্বময়ীর সন্ধানে জাগা, সন্ধান পেয়ে 'বিশ্বজনের প্রাণ' চেতনায় যুক্ত হয়ে মুক্তির মহারসে সমাধিস্থ থাকা। তখন বিশ্বের কেউ-ই আর আমা থেকে পৃথক নয়, মাটির কোলে মাটি হয়ে, সর্বব্যাপী হয়ে, অখণ্ড বিশ্বসত্তায় তখন আমি-ও বিশ্ব। বিশ্বপ্রকৃতির নৃত্যে তখন আমারো নৃত্য, তার ঋতুলীলার ছন্দে তালে আমারো ছন্দ তাল। যখন বিশেষ মাত্র, তখন-ই কেবল বিশ্ব থেকে আমি পৃথক ; বিশেষটি যখন অশেষে মিলাই—তখন তার সঙ্গে আমার আর ব্যবধান নেই। তখন এই অনুভব ঃ

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।

প্রকৃতির অখণ্ড সত্যের সঙ্গে আমার খণ্ড সত্যের যখন মিল হয়, সামঞ্জস্য হয়, তখন বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত নিয়মই আমার নিয়ম, তখন আর বিরোধ নয়, শান্তি, নৈরাশ্য নয় আশা-সান্ত্বনা। তখন ষড়ঋতুর নৃত্যতালে আমারো নৃত্যতাল, অর্থাৎ তখন সুস্পষ্ট এই তত্ত্ববোধ, যে, একঋতুর আবির্ভাব যেমন সত্য, তিরোভাব-ও তেমনি সত্য। তিরোভাব না হলে নবতরের আবির্ভাব সম্ভব না,

আবির্ভাব না হলে রহস্যতিমিরে তিরোভাবের আনন্দ-ও সত্য না। ষড়ঋতুর এই আবির্ভাব-তিরোভাবের নৃত্যছন্দ—নটরাজের 'প্রলয়নাচনে' 'পা-ফেলা পা-তোলার' মত—তত্ত্বময় শুধু নয়, সুরময়-ও বটে। এটি যখন বুঝি, তখন জীবন সম্বন্ধে প্রসন্ন একটি চেতনার অধিকারী হই। তখন বিশ্বাকাশের নিয়মের সঙ্গে ঘটাকাশের কোনো ব্যবধান-ই থাকে না।

বক্তব্য এই ; যে-মাটি থেকে সর্বরূপের প্রকাশ, সেই মাটির কোলে এসে মিলিয়ে নিলাম নিজেকে, নিজত্বের সঙ্গে বৃহতের আর তাই কোনো ব্যবধান রইল না।

'মাটির ডাক' কবিতাটিতে প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য-প্রকাশের যে-নৈপুণ্য আছে—রূপাসক্ত আমাদের মন সহজেই তাতে আকৃষ্ট হয়, গভীরে প্রবেশ করার পূর্বেই যৌবনসুলভ একটা ভাবমাধুর্যের আনন্দ-আস্বাদে চিত্ত স্নিগ্ধ সজল হ'য়ে ওঠে ; এই কারণে এটি একটি সাধারণ প্রত্যাবর্তনের কবিতা বলেই আমাদের ধারণা হয়।

এ-ধারণা পোষণ করে আপনি-ও যদি তৃপ্ত হয়ে থাকেন, থাকুন, কবিতাটির তাতে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না। তখন বলব, আপনাকে তুষ্ট করার জন্যেই অবশ্য বলব : প্রেমের চেতনায় স্বপ্নের মত স্মৃতি-ও আনন্দ। এই আনন্দের প্রবলবেগে কবি যৌবনবেদনায় বিহ্বল হয়ে প্রকৃতির রূপাস্বাদনে পূর্বের মত আবার ফিরলেন। সাধারণ জীবসুলভ ভোগেচ্ছার তীব্রতাই প্রকাশ করলেন দীপ্ত ভাষায়।

কিন্তু পূরবী-কাব্যে তাই কি কবির ইচ্ছা ?

'মাটির ডাকে' সাধারণ প্রত্যাবর্তনের সুর-ই যদি যথেষ্ট, তবে এটি গভীর নয়, পূরবী-কবিতা হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য-ও নয়। কিন্তু জাগার মত ঘুম-ও আমার কাছে সত্য, জন্মেছি যে-উৎসভূমি থেকে, ঘুমের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করব আদিগৃহ সেই উৎসভূমির স্বপ্নলোকে, তখন 'খোলাখুলি' 'কোলাকুলি' হবে বিশ্বজনের প্রাণের সঙ্গে, 'চারদিকে এই যে-ঘর আছে' তার দিকে ফিরে মন হবে অশেষের আনন্দে উদ্দীপ্ত, এই যদি মাটির ডাকের প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য, তবেই

কবিতাটির গভীরতা রসিক চিত্তকে স্পর্শ করে, পূরবীর কবিতা বলে' সেটিকে চিনতে পারাও সম্ভব হয়।

জন্মের আগে ছিলাম বিশ্বমায়ের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে। বিশ্বমায়ের গর্ভ থেকে জন্ম হল—অম্লান নূতন হয়ে এলাম মাটির কোলে ; দিন গেল, বিশেষে আসক্ত হল মন, মা থেকে পৃথক হয়ে চলে 'গেলাম দুরে'। মা-টিকে আর বুঝি মনে-ও রইল না। এখন জীবনসায়াহ্নে তার কোলে ফিরলাম—'জন্মজাত বিশেষ বিশেষ মোহগুলি ত্যাগ করে' ফিরে পেতে চাইলাম হারাণো সৌভাগ্য। কিন্তু কেমন করে তা পাব ?

মৃত্যু জানে।

মৃত্যু জীবনের অবলুপ্তি নয়, তা নবজন্ম, নূতন প্রাপ্তি। তবু বলি—এ-স্থলে মৃত্যুর কথা স্পষ্ট করে বলা মানে-ই রসাভাসের প্রশ্রয় দেয়া। বলা তাই ভালো ঃ

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তিসুখে
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।

যেখান থেকে এসেছি, বিশেষের শিকল ছিন্ন করে' যাই সেখানে চলে ঃ প্রথমজন্মেব আনন্দ করি আস্বাদ। কী হবে তাতে ? না, জন্মের পূর্বে সর্বত্র যেমন সর্বাঙ্গীণ হয়ে ছিলাম, জন্মবিশেষের বন্ধন ছিন্ন করে' সেখানে তেমনি আবার সর্বাঙ্গীণ হতে চললাম। এই-ই প্রকাশ। এই মুক্তি।

এই মুক্তিতে সকলেই যাবে, আজ না-হয় কাল। বস্তু মোহে, কী বিচিত্র, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার এই পুলকোচ্ছ্বাস—অন্তরঙ্গ বিষয় হওয়া সত্ত্বে-ও, ভুলেছিলাম।

কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন।
কাছেকে আজ পেলাম কাছে
চারদিকে এই যে ঘর আছে
অরদিকে আজ ফিরল উদাসীন।

একদিকের বিশেষ কোনো আসক্তিতে আর নয়, চারদিকের অশেষ পুলকে কবি ফিরতে চাইলেন, এটা বুঝলাম, কিন্তু এই ফেরা কি মৃত্যু ?

মৃত্যু সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করেছি তবু জানি—এ-সম্বন্ধে বহু যুগার্জিত ভ্রান্ত সংস্কার আমাদের রয়েই গেছে। মৃত্যুতে আমাদের প্রেম নেই, আছে ভয়। অথচ বিজ্ঞরা জানেন, মৃত্যুর আশীর্বাদটি জীবনে আছে বলেই আমরা চলতে পারি, নূতন আনন্দে ফলতে পারি, নব নব বৈচিত্র্যের পথ বেয়ে একের সমুদ্রে গিয়ে গলতে পারি।...মাটির ডাক কবিতার শেষপংক্তিতে ফেরার যে-কথা আছে তাতে শারীর জীবনের অবলুপ্তি বা মৃত্যুর কথা আরোপ করতে মন চায় না—এটা সত্য, কিন্তু বস্তুমোহের মৃত্যু আসায় কবি ভাব-জীবনের অখণ্ডত্বে জন্মলাভ করলেন—এ-তত্ত্ববোধ রসচেতনায় কি সাড়া তোলে না ?

মাটির ডাকে জন্ম থেকে জন্মান্তরের আনন্দ, প্রথম জন্মক্ষণের রোমাঞ্চ এর ছন্দোগতিতে। 'পঁচিশে বৈশাখ' যদি প্রার্থনার গান, মাটির ডাক তবে প্রাপ্তির সংগীত।

পঁচিশে বৈশাখ-ও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য কবিতা। এর প্রার্থনা-তত্ত্বটি উপলব্ধ হলে পরোক্ষভাবে মাটির ডাক কবিতাটি-ও স্পষ্টতর হবে।

মানুষ যখন জন্মায় তখন 'অসংখ্যের মাঝখানে' 'অম্লান নূতন' হয়ে-ই জন্মায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে সহজ আনন্দের দৃষ্টিতে তখন তাকায়। বস্তু-বাস্তবিকতার কোনো মোহ তার মনকে তখন ভারাক্রান্ত করে না, একটি সরল সচ্ছন্দ পুষ্পসুন্দর পবিত্রতা থাকে তার হৃদয়ে। নবজাতকের কিছু নেই, জ্ঞান নেই, জ্ঞানের অহংকার নেই, ধ্যান নেই, ধ্যানের অন্ধকার নেই, যশ নেই, যশোবৃদ্ধির তৎপরতা নেই, বস্তুসম্পদ নেই, সম্পদের কোনো বিন্ধ্যপর্বত সহজ আকাশকে দাঁড়ায় না আচ্ছাদিত করে। তার কিছু নেই, তাই না সে পবিত্র ? বিশেষের বন্ধনে মন তার বন্দী নয়, তাই না মন তার পূর্ণের প্রতীক ?

জন্মের প্রথমক্ষণটি তাই 'শুভক্ষণ-ই' বটে। শুভক্ষণটিকে সাধনার দ্বারা জীবনে যদি চিরন্তন করা যেত, তবে জ্ঞান থাকা সত্ত্বে-ও মানুষ অহং পরিত্যাগ করত, ধ্যানী হত, সত্যকারের ধ্যানী, তখন ধ্যানের অন্ধকারে কর্মহীন হওয়ার

অহংকার করত না, পলায়নীবৃত্তির অনুসরণে জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মোহে আত্মসমর্পণ করত না।

জন্মের পর দিন যায়, যত দিন যায়, মানুষের জিজ্ঞাসা বাড়ে, আশাআকাঙ্ক্ষা বাড়ে, অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত হয় তার প্রাণ। নানা দ্বেষ, নানা বিদ্বেষ, নানা রোষ, নানা অসন্তোষ তাকে বিক্রুষ্ট করে, বিভ্রান্ত করে। জীবনের প্রতিটি 'নিমেষ' কতভাবে তাকে যে মলিন করে তার ইয়ত্তা নেই। মন তখন মলিন হয়, হৃদয় হয় মলিন, মলিনহৃদয়ের দৃষ্টিতে জগৎসংসার-ও হয় মলিনীকৃত।

নানাভাবে নানামোহে নানা আসক্তিতে মলিনীকৃত মনের কাছে 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণটি' আর ধরা পড়ে না। যে নূতন অনন্ত অম্লান, সেই নূতনটিকে হারাতে হয়, জীবনে তাই পুরাতনের গতানুগতিকতা-ই বাসা বাঁধে। জীবন হয় একঘেঁয়ে, বেঁচে তখন মরে থাকা-ই হয় সার।

এই মরা, একে মৃত্যু বলি না, বলি অপমৃত্যু। এ থেকে বাঁচতে চাই, তাই সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নব নব জন্মের চেতনা চাই: জন্মদিনের প্রথমতম শুভক্ষণটির সৌন্দর্য ও মহিমা উপলব্ধি করতে চাই। একটু ঘুরিয়ে বলি— অপমৃত্যুময় এই গতানুগতিক অসাড় জীবনে মরে গিয়ে বেঁচে উঠতে চাই 'ক্ষয়হীন' সেই শুভক্ষণের আস্বাদে। প্রার্থনা তাই:

হে নূতন
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন যেমন, 'শীর্ণ নিমেষের' মোহ-মলিন জীবনের অপমৃত্যু থেকে তেমনি, হে নূতন, তুমি জেগে ওঠ। সূর্য যেমন কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করে জাগে, জীবনের আসক্তি-বন্ধনের অন্ধকার ভেদ করে সূর্যোপম তুমি, হে আমার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ, ওঠো জেগে। শীতার্ত শীর্ণ শাখায় কিশলয় যেমন বসন্তের জয়ধ্বজা উড়িয়ে অরণ্যকে করে প্রাণচঞ্চল, সেই মত হে নূতন, বস্তুব্যস্ততার রিক্ত এই জীবনের বক্ষ ভেদ করে' আপনার মুক্তিমহিমা উন্মোচন করো। বস্তুমোহে প্রভাবিত হয়ে সীমিত জীবনটুকুকেই প্রভূত ভেবেছি—পরোক্ষে জীবনের পরাজয় এনেছি ডেকে, তোমার আবির্ভাবে জীবনের জয় সূচিত হ'ক, তার মহিমা হ'ক অভিব্যক্ত—সৃষ্টির নির্মল অভিব্যক্তিতে অনন্তের যে অভাবনীয় অপাবৃত আনন্দবিস্ময়, হে নূতন, তোমার আবির্ভাবে তা ব্যক্ত হ'ক প্রকাশভুবনের সান্ত-ভূমিকাতে-ও।…অনন্ত বিধাতার অক্লান্ত বিস্ময় এই : সান্তের মধ্যে-ও তুমি আছ, তুমি আস, যতটুকু অল্প সময়ের জন্য-ও হ'ক না, তুমি সরল সৌন্দর্যে নির্মল মাধুর্য দান কব জীবনে, জীবনকে জানাও তার অনন্ত মুক্তির রসানন্দ। এই সত্য আজ প্রমুদিত হ'ক, তোমার আবির্ভাবেব মধ্য দিয়ে অনন্তের বিস্ময়চেতনার রসাবেগটি হ'ক অভিব্যক্ত।

ব্যক্ত হোক জীবনের জয়
ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।

নূতন কব, নূতন কর অন্তরে-বাহিরে, 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি' আপনারে করো উন্মোচন'—এই প্রার্থনা মাটির ডাকে পেয়েছে পূর্ণত্ব। মাটির ডাকে কবি নূতনকে পেয়েছেন, ডাকে সাড়া দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতির সর্বব্যাপিতায়।

ডাকে সাড়া দিতে পারলে-ই নবজন্ম ঘটে। অসাড় আমাদের আটপৌরে গতানুগতিক ঘর-সামলানো মন, তুচ্ছ বিশেষেই করে উচ্চ গরিমা। পূরবী কবির নির্দেশ এই : বিশেষমোহে মৃত্যু না এলে অশেষের আহ্বান ব্যর্থ। নবজন্ম তখন কথার কথা।

অর্থাৎ যাতে আছেন তাতে 'ভঙ্গ' দিতে না পারলে নবরঙ্গে জন্ম সম্ভবই

নয়। যাতে আছেন, তাই-ই যদি একান্ত সত্য বলে' জানেন, তবে আপনি চলৎশক্তিরহিত পঙ্গু প্রলয়ের উপাসক মাত্র। আপনি তখন তপস্বী, সন্দেহ নেই—কিন্তু সৃষ্টির নয়, প্রলয়ের।

সৃষ্টিকে রোধ করাব আনন্দটি যদি তপস্যা, সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার আনন্দটি তবে তপোভঙ্গ।

নবজন্মের অক্লান্ত বিস্ময় তপোভঙ্গে। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি একবার স্মরণ করুন।

পণ্ডিতেরা জানেন, ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করে মনের অতীতে বিজ্ঞানানন্দের যে বৈদান্তিক তপস্যা, বলা বাহুল্য, বস্তুগত এমন কি মনোগত ইন্দ্রিয় জগতের তাতে স্থান নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ মিথ্যা বা মায়া হয় এই বিজ্ঞানানন্দের নৈষ্ঠিক তপশ্চর্যায়। মহাদেব নাকি এই তপস্যার আদিসাধক। প্রলয়ের ডম্বরু বাজিয়ে সৃষ্টির অতীতে তাঁর তুরীয় আনন্দ।

জাগতিক বিচারে সৃষ্টিবিরোধী এই তপস্যার নাম-ই প্রলয়। প্রলয়ে আর কিছু নেই, নেই আলো, নেই অন্ধকার, নেই জ্ঞান, নেই অজ্ঞান, নেই ইন্দ্রিয়, নেই অতীন্দ্রিয়, নেই কিছু। এমনতর প্রলয়ঙ্কর নিরাকারত্বের রুদ্রদেব শংকর, আত্মমগ্ন স্থিতপ্রজ্ঞতায় তিনি সমাধিস্থ। ইনি কি আর 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি'র কথা মনে রাখেন, না রাখবার কথা?

মনে রাখেন না এ যেমন সত্য, সৃষ্টিটা আছে, রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে শোভিতা হয়েই আছে, এ-ও তেমনি সত্য। অন্ততঃ বিজ্ঞানানন্দে যতক্ষণ না উন্নীত হচ্ছি, উন্মেষিত হচ্ছি, ততক্ষণ জগৎসৃষ্টি সত্য, বস্তুগত জগৎজীবনেব মনোগত উচ্ছল দিনগুলি সুন্দর।

তপোভঙ্গে জগতের জন্ম: নিরাকারত্বের নীহারিকা ভেদ করে' সাকার সৃষ্টির আবির্ভাব। নিরাকার থেকে সাকারে না এলে লীলা হয় না, তপঃ থেকে তপোভঙ্গে জন্মগ্রহণ না করলে 'বসন্তের উন্মাদনরসে' কমণ্ডলু ভরা যায় না। প্রলয়ই একমাত্র সত্য—এই তত্ত্ব-ই যদি স্বীকার করি, তবে সৃষ্টি অর্থহীন, তাৎপর্যবিহীন। প্রলয়ে মৃত্যু এলে তবেই সৃষ্টিতে গতি, সৃষ্টিতে মৃত্যু এলে তবে প্রলয়ে সমাধি। প্রলয়ঙ্কর রুদ্রদেব একদা সৃষ্টির অতীতে অবাঙ্‌মন-

সোঽংগোচর ছিলেন, ছিলেন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য অপ্রেম—এ-কথা না-হয় মানা গেল। কিন্তু সৃষ্টিটা যখন স্থূলভাবে রয়েছে দেখছি, দেখছি ক্ষিতিঅপতেজমরুৎ-ব্যোমবিভূষিত জীবনজগৎ, দেখছি, ষড়ঋতুর নিয়মিত আবর্তন, মহাকাশের নিত্য নব চলমান বর্ণলীলা, নদনদীসাগরের নিত্যালোড়ন, মরুমেরুর বিচিত্র ঔদাসীন্য, পর্বতের ধীরশান্ত অটলতার তপস্যা, তখন প্রলয়তত্ত্বকে দর্শনবিচারে স্বীকার করি বলে' সৃষ্টিব্যাপারকে মিথ্যা বলব, এটা কথার কথা নয়। দেখছি এটা আছে, সুতরাং এককালে এর জন্ম হয়েছে ঃ অন্ধকারের অগম পার থেকে, রুদ্রপ্রসাদাৎ নীহারিকা থেকে সূর্য, সূর্য থেকে এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপপৃথিবী হয়েছে আবির্ভূত।

প্রলয়ঙ্কর উদাসীন মহাদেব তবে সৃষ্টির দেবতা হয়েছিলেন! যোগধ্যানের তুরীয় অবস্থায় বিচিত্র সেই সৃষ্টির দিনগুলি আজ হয়তো-বা তিনি ভুলে আছেন, কিন্তু একদিন তার হাতে ডম্বরু শিঙার বদলে—মঞ্জিরা বাঁশরী বেজেছিল, বসন্তে উন্মাদনরসে কমণ্ডলু তার ভরেছিল, তা নইলে সৃষ্টি হ'ল কি করে?

যেদিন 'তপোভঙ্গ' হল প্রলয়-শংকরের ঃ কবিপ্রজাপতির আনন্দ হ'ল রোমাঞ্চিত। সৃষ্টি-বেদনার কী অনন্ত ঐশ্বর্য আছে তাঁর মধ্যে তা' তিনি সেদিন জানলেন ঃ

> বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান ;
> জটিল জটাল বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান—
> শুনিলে তন্ময়।
> যেদিন ঐশ্বর্য তব
> উন্মেষিল নব নব
> অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।
> আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
> আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
> বিশ্বের ক্ষুধার।
> —তপোভঙ্গ।

প্রলয় থেকে সৃষ্টিতে আবর্তন—এ এক নবজন্ম। আবার সৃষ্টি থেকে প্রলয়ে প্রত্যাবর্তন সে-ও এক নবীনজন্ম। জীবনলীলায় দুয়েরই প্রাধান্য। লীলাময়

যদি ও-পারে সমাধিস্থ, তবে 'নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে' সংগুপ্ত তিনি প্রলয়ঙ্কর রুদ্র-শংকর; যদি এ-পারে নরীনৃত্যমান, তবে নিত্যনূতনের লীলাক্ষেত্রে প্রকাশিত তিনি উমানাথ শিব-সুন্দর। জীবনশংকরের তবে দুই লীলা: এক লীলায় সংহরণ, আর লীলায় প্রকাশন। সংহরণ সংহরণেই শেষ নয়, গতি তার প্রকাশনে; প্রকাশন প্রকাশনেই শেষ নয়, গতি তার সংহরণে।

জীবনসন্ধ্যায় শিঙা যদি বাজে, তবে ভয় কেন? সংশয় কেন? আজ মহাদেব যদি হৃতসর্বস্ব অকিঞ্চন সাজেন, কেন বুঝব না, এ-ও এক নূতন লীলা? সন্ধ্যায় রাখাল তার ধেনুগুলিকে মাঠ থেকে ঘরে নেয় ফিরিয়ে, কালের রাখাল যদি 'দিনধেনুগুলিকে' 'স্তব্ধ গোষ্ঠগৃহে' নেয় ফিরিয়ে, সে তো আগামী প্রভাতে নূতন করে আবার চরিয়ে ফেরার উদ্দেশ্যেই!

আজ মহাদেব যদি বিশ্বরিক্ত, প্রলয়ের অন্ধকারে সংগুপ্ত, তবে বুঝতে হবে—'চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে' নূতনবেগে আবার ভাসমান হওয়ার-ই তা সূচনা। যৌবনের দিন, সৃষ্টির মহোৎসবের মহোত্তম দিন চিরকাল বন্দী থাকবে প্রলয়ের অন্ধকারে, এটা জগৎলীলার সত্যতত্ত্ব নয়।

> বন্দী যৌবনের দিন
> আবার শৃঙ্খলহীন—
> বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
> বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসননাশন
> বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন,
> তারি সম্ভাষণ।
> —তপোভঙ্গ।

উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করামাত্র এ-জাতীয় কবিতার মর্মোদ্ধার ও তত্ত্বোদ্ধার হয় বলে' জানি। বিদগ্ধজনের কাছে কেন, বালকদের কাছে-ও, এ-কবিতার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবু যে ব্যাখ্যা করছি, করতে হ'চ্ছে তা, এই কারণে, সহমর্মী একাধিক বিখ্যাত সমালোচক তপোভঙ্গ কবিতাটির ওপরে-ও বালকের সারল্যে অবিচার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তপোভঙ্গে কবিরো নাকি তপোভঙ্গ হয়েছে!!

তপোভঙ্গে কবি তাঁর স্বভাব ও ধর্মবিরোধী কোনো সত্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে' আমার মনে হয় নি। কবি হচ্ছেন জগৎলীলার গাথক, যৌবনের অর্থাৎ প্রকাশশক্তির, সম্ভাষণ রচনাই তাঁর কর্ম, কবিকর্ম। রূপমোহে আপনি যখন তামস-তপস্বী অর্থাৎ আসক্তি ঘোরে যখন ভোগোন্মত্ত, সেই হেতু বিলাসস্থবির, তখন যেমন তাঁর তীব্র প্রতিবাদ,—তত্ত্বমোহে আপনি যখন সত্ত্ব-তপস্বী অর্থাৎ সৃষ্টিবিরোধী প্রলয়সাধনায় যখন সমাধিস্থ, সেই হেতু সন্ন্যাসস্থবির, তখনো তাঁর তেমনি প্রতিবাদ। জগৎ-ব্যাপারে কোনো প্রকার স্থবিরেরই স্থান নেই, চলমান চঞ্চলের নিত্যলীলার মহারাজ্যে 'শৃঙ্খলহীন' যৌবনগতির-ই প্রাধান্য। এ-সত্যের বিরোধিতা আপনি করতে পারেন, কিন্তু কবি জানেন তাতে অপমৃত্যুর পথ-ই পরিষ্কার করা হয়।

তপোভঙ্গে বলা হ'ল ঃ যাতে-ই থাকি না কেন, তা থেকে আমাকে গতি পেতেই হবে। 'ভঙ্গতার' তাৎপর্য-ই হ'ল গতি। তপোভঙ্গ কি ? বিশেষ কোনো তপস্যার (তা সে বস্তুতপস্যাই হ'ক আর ব্রহ্মতপস্যা-ই হ'ক) মগ্নতা থেকে অন্যতর কোনো জীবনপ্রকাশের অভিমুখে অগ্রগতির নাম-ই তপোভঙ্গ। 'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের'—এ উক্তির অভিধার্থ যাই হ'ক না কেন, ব্যঞ্জনার্থে এটি চিরন্তন গতিরাগের সমর্থক। …জগতের জন্মলীলা বলুন অথবা মৃত্যুলীলা বলুন—দুই লীলাই তপোভঙ্গের কল্যাণে।

সন্ধ্যায় যদি জীবনটা সর্বরিক্ত মহাদেব হয়ে থাকে, আশা এই ঃ আগামী প্রভাতে সেই আবার 'সুন্দরের হাতে আনন্দ চাইবে পরাভব।' আজ যদি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজে থাক, নেতিতত্ত্বের আনন্দে হও আত্মমগ্ন, মনে মনে জানি, জীবন-দেবতার এটী ছলনা মাত্র, জীবনকে নূতনতর উল্লাসে উজ্জীবিত করে' পাওয়ার অভিপ্রায়ে জীবনসংহরণের এই আশ্চর্য লীলা।

> তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
> বিলীন বিরহ তলে,
> উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
> ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
> দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
> আমি সেই কবি।
> —তপোভঙ্গ।

কবিকর্মের তত্ত্বটি তবে স্পষ্ট হল। বিশেষ কোনো তত্ত্বদর্শনের সত্যে যাঁরা বিশ্বাসী, কবির এই সৃষ্টিদর্শন তাঁরা না-ও মানতে পারেন, কিন্তু জীবন-মহাদেব যেখানে উমার পাণিপীড়ন করেন, সেখানে তিনি মনোদর্শনের তত্ত্বরসিক, কবিকে সেখানে না মেনে তিনি পারবেন না। বাসর কক্ষে অস্থিমালা তো শোভা পায় না—পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি হাতে কবি তখন তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অভ্যাথত-ই হন। ভোলানাথের নূতন বেশভূষা দেখে আনন্দিনী উমা কবিকে স্মিতকৌতুকে আশীর্বাদ করেন।

এ কবি তো মানুষের চিরন্তন যৌবনরঙ্গ, তপোভঙ্গে এর যুগে যুগে আবির্ভাব। বস্তু-জিগীষার অন্ধ মোহে মানুষ যখন প্রমত্ত তখন এ-যৌবনের দেখা মেলে না, মোহ-ভঙ্গে এর আবির্ভাব ; ধর্মানুষ্ঠানের সংস্কার-মোহে মানুষ যখন আবিষ্ট, তখন এর দেখা মেলে না, আবিষ্টতার মোহভঙ্গে, তপোভঙ্গে, এর আবির্ভাব। 'ভাঙামন্দিরে' চিরচরিত ধর্মানুষ্ঠানের কোনো চর্যা নেই, তবু সেখানে নিত্যপূজার আনন্দ বিরাজমান, এই তত্ত্বে-ও, চমকে উঠবেন না, তপোভঙ্গের ব্যঞ্জনা।

ভাঙামন্দির বাহিরে সেজেছে অকিঞ্চন, স্থূল দৃষ্টিতে কিংবা গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতার আবিষ্ট দৃষ্টিতে এর সৌন্দর্য ধরা পড়ে না, বোঝা যায় না কোথায় কী ভাবে অকিঞ্চনতার তপোভঙ্গে নবসৃষ্টির আনন্দ হয়েছে লীলায়িত। জীবনটা বুঝি এমনতর-ই। দেহমন্দিরটা সন্ধ্যাকালে যদি ভাঙাই হয়ে থাকে, সকলেই যদি ত্যাগ করে' যায় একে একে, ত্যাগ করে চোখের জ্যোতি, কানের শ্রবণশক্তি, হাতের কর্মশক্তি, তবু ভয় পাই নে—মনে মনে জানি, বাহ্য এই সমস্ত দীনতা ও হীনতার অন্তরালে নবতর কোনো সূচনার স্বর্গ হচ্ছে নির্মিত। 'ভাঙিয়া নূতন করে খেলাই' তো জগৎধর্ম।

ভাঙামন্দিরে বলা হ'ল : প্রতিমা এখানে চূর্ণ হয়েছে, বেদিতে নিবিড় শূন্যতা, সাধারণদৃষ্টিতে সেখানে আর পূজা সম্ভব না। দেবতা সেখানে আর নেই —এই ধারণায় সন্ন্যাসীরা আর কেউ আসে না। ভাগ্যে আসে না, নির্জনতা তাই অক্ষুণ্ণ থাকে, আর সেই নীরব প্রশান্তিপূর্ণ ধ্যানসুন্দর পরিবেশে সুন্দরের ঘটে আবির্ভাব : প্রলয়ের শূন্যতা ভেদ করে' সৃষ্টির পূর্ণতা হয় লীলায়িত :

নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে
প্রসাদ অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।

'স্খলিত ভিত্তি'—এটা জাগতিক। 'পুণ্যময় হল'—এটা মানসিক, বলতে পারেন, আধ্যাত্মিক-ও। 'চেতনার দ্বারা চেতনাকে' যখন পাওয়া হ'ল তখন তা আধ্যাত্মিক নয় তো কী?

> আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনি আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে' আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ। *

'সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ': ভাঙা যেমন, গড়া-ও তেমনি তাঁর আনন্দলীলার তরঙ্গরূপ। জন্ম তাঁ থেকে, মৃত্যু-ও তাঁ থেকে ; এবং মৃত্যু যেহেতু তাঁ থেকে, মৃত্যু মৃত্যুতেই নয় শেষ, নবজন্মে তার পুনর্যাত্রা।

কবির ভাষায়, এই উপলব্ধির আনন্দচেতনা-ই 'প্রভাত'। জীবনসায়াহ্নে কবি প্রভাত চেতনার আনন্দরস আস্বাদন করছেন। পূরবী তাই সন্ধ্যার প্রেমমহিমায় প্রভাতসঙ্গীত। কবি গাইছেন:

ধূলি উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যুতরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ, শব্দহীন সুর।
আমরা নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।
—প্রভাত।

* শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০,

তাৎপর্য এই : চেতনায় যখন প্রভাত স্পর্শ করে তখন 'নয়নের' দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, 'মনের' গতিশক্তি বাড়ে। নয়নে তখন যা দেখি তারো চেয়ে গভীরতর কিছু দেখি, দেখি 'সুনীল সুদুরেব' সৌন্দর্য। মনে যা পাই—তারো চেয়ে গভীরতব কিছু পাই, পাই 'সুনীল সুদুরের' সন্ধানসুখ। অগম অদৃশ্যের স্বপ্ন-চেতনায় নয়ন ও মন তখন অভিনব এক জীবন-প্রভাতে হয় জাগরিত। প্রতিক্ষণেই তখন জন্মেব প্রথম শুভক্ষণ করে আস্বাদ।

এতে লাভ কী ?—উদাসীন বালকদেব প্রশ্ন।

বিশেষ কী লাভ তা জানি না, তবে লীলাসঙ্গিনীর প্রেমলাভ হয়, তা জানি। নবীন যে, নিত্যনবায়মান যে, নব নব রূপে লীলাসঙ্গিনী আসেন তার জীবনে।

অখণ্ডজীবনেব তিনি প্রাণপ্রকৃতি, জীবনেব প্রকাশে তিনি, জীবনের অপ্রকাশে তিনি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসেন লীলামাধুর্যে ; অন্তরের অনুভাবে দর্শন দেন। ডাক দেন। মরণেব মহালোকে-ও তাঁব চেতনলীলা।

পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' একটি বিখ্যাত কবিতা। স্বীকাব করতে দ্বিধা নেই—এই কয়েক বৎসর আগে-ও এ-কবিতাব মর্মার্থ ঠিকমত বুঝতে পারি নি। এর যে একটি সাধারণ অর্থ আছে—সেইটিই ভাসা-ভাসা ভাবে গ্রহণ করে' চিত্ত তৃপ্ত ছিল, গভীরার্থের অন্তর্লোকে প্রবেশ কবাব সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল না তেমন। বৃদ্ধবয়সে কবি লীলাসঙ্গিনীর ডাক শুনেছেন, যৌবনমোহে আবাব প্রত্যাগত হয়েছেন প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের লীলালোকে—এমনতর একটা হাস্যকর অপব্যাখ্যাতেই অহংকৃত মন তখন আচ্ছন্ন ছিল। ... ..আমাব পূর্বসূরীরা-ও এ-কবিতার সাধারণ একটি সহজ অর্থ-ই গ্রহণ করেছিলেন বলে' জানি। আমাদেব একজন বিদগ্ধ বন্ধু লিখেছিলেন—"অতীতের সৌন্দর্য্য ও রসভরা দিনগুলিকে যখন ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তাহাব সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটি-ও অতি করুণ ঝংকাবে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই বেদনা সব চেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতে।" * ... বিচারবোধ তেমন সূক্ষ্ম ছিল না, সেই

* ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৩৪০-৪১

কারণে এ-হেন মন্তব্যে কোনো সংশয় তখন জাগে নি। মনে হয়েছিল মানসী-কাব্যের 'মানসী', তরী-কাব্যের 'মানসসুন্দরী', চিত্রা-কাব্যের 'জীবনদেবতা', কল্পনা-কাব্যের স্বপ্ন-'মালবিকা', ক্ষণিকা-কাব্যের 'বর্ষাভিসারিকা', উৎসর্গ-কাব্যের 'স্মৃতি অবগাহিনী' কি বলাকা-কাব্যের 'চঞ্চলা-বৈরাগিণী' প্রভৃতি ভাবপ্রতিমা-গুলির সঙ্গে পূরবী-কাব্যের লীলাসঙ্গিনীর বিশেষ কোনো পার্থক্য-ই নেই। কবিতার সুরুতেই কবি সঙ্গিনীকে দেখেই চিনতে পেরেছেন এমন একটা স্বীকৃতি থাকায় এ-ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক-ই হয়েছিল। কবি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন—তবু যখন যৌবনের সেই লীলাসঙ্গিনী আবার এল, পূর্বের মত ফিরতে কি হবে না পুরাতন পথে ? পূর্বে যে-সুর গেয়েছেন, যে-ছবি এঁকেছেন—আবার কি যেতে হবে না সেই সুর গাইতে, সেই ছবি দেখতে ?

বলাকার অগ্রগতি পূরবী-তে তাহ'লে ব্যাহত হ'ল বলুন ? সম্মুখের টানে যাবার গান সমাধা করে' এবার তাহ'লে তিনি মোহভরে পিছু হট্‌তে সুরু করলেন ! নাকি রসভরা দিনগুলি ফিরে পেতে চাইলেন, কিন্তু বয়স গেছে, তেমন করে আর ভোগ করতে পারলেন না, তাই দুঃখ, তাই নৈরাশ্য, 'করুণ ঝংকারে হৃদয়তন্ত্রীতে' তাই পীড়া ও বেদনার মূর্ছ্না ?

লীলাসঙ্গিনীতে সাধারণ প্রত্যাবর্তনের সুর শুনলে এমনতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বোঝার দোষে এমন অনবদ্য ভাবগর্ভ কবিতাটির ধ্বনি-ও আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আসলে লীলাসঙ্গিনীর সুর নিত্য অগ্রগমনের সুর, অপ্রকাশের সূর্যালোকে আনন্দাভিযাত্রার সুর। নবতর জন্মক্ষণের প্রতীক্ষোন্মাদনা সেই সুরে।

প্রয়োজনের জগৎ থেকে অপ্রয়োজনের আনন্দে যিনি ডাক দেন, বৈচিত্র্যের পথ বেয়ে একের অভিমুখে মানবাত্মাকে টান দেন রসাবেগের প্রাণচাঞ্চল্যে, কবির ভাষায়, তিনি লীলাসঙ্গিনী।

'লীলা' কথাটি প্রসঙ্গতঃ একটু ব্যাখ্যা করি। লীলা কি ? না, সোজাকথায় তা খেলা, তা বিলাসকলা। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে লীলা হচ্ছে রতিপ্রকাশ, যেমন মেদিনীকরবৈদ্য বলেছেন 'শৃঙ্গারভাবচেষ্টা'-ই লীলা। তবুও লীলার একটু

বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন, অঙ্গপ্রসাধন, বেশভূষা, ইঙ্গিতময় দৃষ্টি ও অর্থপূর্ণ হাবভাব, হাসিকৌতুক ও প্রীতিকথার দ্বারা প্রেমাস্পদের মনোরঞ্জনের যে রতিপ্রচেষ্টা, তার নাম লীলা : অলব্ধপ্রিয়সমাগময়া স্বচিত্তবিনোদনার্থং প্রিয়স্য যা বেশগতিদৃষ্টিহসিতভণিতৈরনুকৃতিঃ ক্রিয়তে সা লীলা। এই লীলা পুরাণকারদের মতে, দ্বিবিধ : প্রকটা, যা দিনজীবনে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনে প্রমুদিতা—এবং অপ্রকটা যা দিনান্তজীবনের, অতীন্দ্রিয় রহস্যজীবনের, তিমিরগভীর সূর্যমণ্ডলে সংস্থিতা। পদ্মপুরাণে, ভাগবত পুরাণে-ও বটে, বলা হয়েছে : সা প্রকটা-প্রকটভেদেন দ্বিবিধা যথা। প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।

লীলা তাহ'লে প্রেম, এ-পারের প্রেম, আনপারের প্রেম। লীলাসঙ্গিনী যিনি, নব নব রূপে তিনি প্রাণে আসেন, গানে আসেন, ধ্যানে আসেন। যতটুকু তাঁ থেকে পাই, পেয়ে প্রেরণা অনুভব করি, ততটুকু বলি এ-পারের লীলা, প্রকটা লীলা। আর যতটুকু পাই না, শুধু মনের গভীরে ধ্যানে পাই, নাগাল পাই না বলে' গতির গান গেয়ে চেতনার বেগে এগিয়ে চলি, ততটুকু-র বাইরে তার আনপারের লীলা, অপ্রকটা লীলা। ...লীলাসঙ্গিনী তাহ'লে প্রকাশে আছেন, আছেন রূপবৈচিত্র্যে, রতিবৈচিত্র্যে আছেন রূপে-রূপে, ভাবে-ভাবে, বর্ণে-বর্ণে, চেতনায়-বেদনায়। কিন্তু, না বললে-ও চলে, এটাই তাঁর সব পরিচয় নয়। অরূপের মহালোকে জ্যোতির্দীপ্তা তিনি রাত্রিরূপিণী, এ-লোকের ভাষায়, তিনি অন্ধকার।

এমনটা কেন তিনি ? না, আমি-ও যে এমনতর। যা আছি, যতটুকু প্রকাশিত হয়ে আছি, ততটুকুব মধ্যেই তো আমি সীমিত না। সাধনার দ্বারা যা হচ্ছি, আরো হব, হতে হতে যাব, যাব প্রভাতে, প্রভাত থেকে সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা থেকে নূতনতর কোনো প্রভাতে, প্রভাত থেকে গভীরতর কোনো রহস্য-সন্ধ্যায়। যাব, যাব আর হব, হতে হতে যাব, পথের শেষ না পাওয়া পর্যন্ত হওয়ার-ও নেই শেষ : যেতে যেতে তাই হব, অহরহ বৈচিত্র্যের বহুতর পথ বেয়ে মহা-একের সন্ধানে প্রস্তুত হওয়ার আনন্দে চলব,—চলব, চলব আর চলব, চলাটাকেই জানব ইহজীবনের মুক্তি—এই যে ভাব, এই যে সুদূরাভিযাত্রী নিত্যনবীন পান্থ-প্রাণ, এর বিশ্বব্যাপ্ত অসীমসত্তার মঙ্গলমাধুর্যে-ও যে আছি !

আছি এখানে, আছি সেখানে। সঙ্গিনীটি-ও তাই প্রকটা, অপ্রকটা চ। আছেন এখানে প্রকাশে, নানারূপে,—আছেন সেখানে, অপ্রকাশে, মহারূপে। আমার মতো হয়ে আমার মনোরঞ্জনার্থে তার প্রেমবিলাসের অন্ত নেই, তাই না লীলা? লীলা যে রসের কথা, আর রস তো জমে তার সঙ্গে—সেই নারীর সঙ্গে, যিনি প্রিয়স্য মনোবৃত্ত্যনুসারিণী?

অনেক সময় অবশ্য এমন-ও হয়, আমি কী, কী আমি চাই, নিজে-ও ঠিক মত জানি না। অকাজে তাই মাথা ঘামাই, কাজের কক্ষকোণে তাই সময় করি অপব্যয়। কিন্তু লীলাসঙ্গিনী যিনি, প্রেমের আনন্দে আমার ভালোমন্দ, প্রেয়শ্রেয় ঠিকটি বোঝেন। আর বোঝেন বলেই যথাসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আসেন কাছে, ভোলান মন, কাজভাঙানো গানে ভরেন হৃদয়। গতানুগতিকতার পুরাতন পথ থেকে হঠাৎ তাই জেগে উঠি বৈচিত্র্যের নবতায়। পুনরুজ্জীবিত হয় জীবন।

লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাবের অর্থ-ই হচ্ছে নবগতির লীলাবিলাস, অনন্ত আশ্বাস এই বিলাসে। তিনি এলেই বুঝতে হবে: নূতনতর কোনো অভিনব রসলোকের মহানন্দে এবার আমায় অগ্রসর হতে হবে।

মানুষের জীবনে-জীবনে আছেন তিনি, এই লীলাসঙ্গিনী। তাই না মানুষ রচনা করতে পারে বাঁচার আনন্দ, রচনা করতে পারে শিল্পসাহিত্যগাননৃত্য ধর্মদর্শন? আনন্দের প্রয়োজনে তার ডাক: বস্তুমোহের বন্ধন ছিন্ন করে' তার লীলা। সহস্র কার্যের মধ্যে তার ছন্দোনূপুর যখন শুনি—কানে বেজে ওঠে নবজীবনের সান্ত্বনা-সংগীত, চোখে ভেসে ওঠে নীলাকাশের সুনীল সুদূর।

কবির জীবনে এই লীলাসঙ্গিনীর দেখা হয়েছে বারংবার। যখনি ইনি অন্তর্লোকে দেখা দিয়েছেন, তখনি কবিকে অপূর্ব কোনো নূতনতার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। কবির তাই বিশ্বাস হয়েছে, লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাব বা আহ্বানের অর্থ-ই হচ্ছে অভিনবতার পথে অগ্রগতি। 'মানসী'রূপে যখন ইনি আবির্ভূতা

হলেন—বাসনাময়ী বেদনার বৈচিত্র্যে কবির চিত্ত রঞ্জিত হ'ল, কবি বুঝলেন—যৌবনের মানাভিমান, চাওয়া-পাওয়া ও আশানৈরাশ্য যেমন সত্য, অভিমানের করুণ মাধুর্যে ত্যাগচেতনার আত্মযন্ত্রণাটি-ও তেমনি সুন্দর। 'সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি' দিয়ে 'আকাঙ্খার ধনকে' যে ছিঁড়ে নেয়া যায় না—যন্ত্রণার চেতনায় কবিতা উপলব্ধি করলেন। স্বভাবকে স্বভাবের দ্বারা উত্তীর্ণ করে'-নেয়ার ব্যাকুলতাটি মানসী-গীতিতে ঝংকৃত হল ; ভাষান্তরে বলা যায়, মানসী-রূপে লীলাময়ী আবির্ভূতা হয়ে যৌবনের বেদনা থেকে কবিকে যেন বৃহৎজীবনের ভূমিকায় টেনে আনার গান গাইলেন। আবার 'মানসসুন্দরী'রূপে তিনি যখন এলেন, দেখা গেল, মানবিক হয়ে-ও তিনি প্রাকৃতিক, প্রাকৃতিক হয়ে-ও তিনি মানসিক। সুন্দরীর প্রভাবে কবির ধ্যান কেবল মাত্র চিত্তগত প্রেমরতির সীমাতেই তখন আবদ্ধ রইল না, আকাশগত বিরাট ভূমিকায় অসীমের সন্ধানে ফিরল। 'জীবন দেবতা'রূপে যখন তাঁকে দেখা গেল—রূপাভিসারী বহির্মুখী মন তখন স্বাদ পেয়েছে অন্তর্মুখিতার সুধারস। কবি উপলব্ধি করলেন, যে, জীবনে তিনি যা করছেন, দেখছেন, ভাবছেন—সবের-ই মূলে এই জীবনদেবতার প্রাণপ্রেরণা। এই জীবনদেবতাকে যদি মৃত্যুদেবতা বলে' ধ্যান করা যায়, তবে দেখা যাবে মৃত্যুরূপে তিনি-ই অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিত থেকে কবিকে নিত্যনূতন ধ্যানে—প্রাণ হতে প্রাণে, গান হতে গানে টেনে নিয়ে চলেছেন। ইনি-ই 'কল্পনা'র 'মালবিকা'-রূপে এলেন—লোকজীবনের দূরগত স্বপ্নস্মৃতির সঙ্গে বর্তমান কর্ম-সাধনার যোগসূত্র স্থাপন করতে। ফাল্গুনে নয়, 'ঘন বরষায়' 'অভিসারিকা'রূপে তাঁর দর্শন মিলল ; নবোদিত গানের মাধুর্যে স্নিগ্ধসজল হ'ল হৃদয়মন। 'স্মৃতি-অবগাহিনী' তিনি, দূর অতীতের সঙ্গে যুক্ত করলেন বর্তমানের চলমান জীবনকে, ভবিষ্যৎ-ও প্রমুদিত হ'ল কবির ধ্যাননেত্রে। ভৈরবী, বৈরাগিণী তিনি, এলেন যেন চলে-যাওয়ার আনন্দে-ই, 'উদ্দাম উধাও' বেগে চলে-যাওয়া-ই তবে সৃষ্টির উল্লাস ! চলা নেই তো সৃষ্টি নেই !

এ-সমস্ত-ই লীলাসঙ্গিনীর বিচিত্র রূপ। রূপে রূপে নানারূপে বিচিত্রা এই লীলাসঙ্গিনী—অন্তর্লোকে যখন-ই আবির্ভূতা হন—তখন-ই জীবনের কোনো না কোনো বন্ধ দ্বার হয় উন্মুক্ত।

আজ 'দুয়ার বাহিরে' তাকিয়ে যখনই জানা গেল তিনি এসেছেন, তখন অতীতের সব কথা কবির মনে পড়ে গেল বলেই অনাগত ভবিষ্যতে-ও অনায়ত্ত কোনো রসভুবনের প্রকাশ যে আবার ঘটবে—এ-বিশ্বাস জাগরিত হ'ল। 'কাজ ভোলাবারে কাজের কক্ষকোণে' যিনি বারংবার ফিরেছেন, তিনি যখন আবার এসেছেন, তখন কাজের তৎপরতা তাকে ভুলতেই হবে : কবিকে এবার কর্মান্তে নবতর কোনো রসের ভুবনে প্রবেশ করতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন এই : লীলাসঙ্গিনী যখন এসেছেন তখন পূর্বেব মত আবার কি কবিকে 'মানসপ্রতিমাগুলি' নানা 'আভবণে' সাজাতে হবে ? 'মানসী' রূপে, 'মানসসুন্দরী'রূপে 'বিদেশিনী'রূপে এতকাল যে-প্রতিমা তিনি সাজিয়েছেন—পুরাতন সেই মানসপ্রতিমার রূপানুরাগের প্রণয়পথে-ই কি তিনি ফিরবেন ? আর ফিরে গেলেই কি সার্থক হবেন জীবনে ? দিনজীবনের বেলা যদি পড়ে এল, দিনজীবনের রূপানুবাগে আবার মত্ত হয়ে কী ফল ?

> দেখ না কি, হায় বেলা চলে যায—
> সারা হয়ে এল দিন।
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
> শেষ বাগিণীর বীণ।

শেষ রাগিণীর বীণা যখন বাজছে তখন এল কেন লীলাসঙ্গিনী ? আবার কি নূতন করে পালা হবে সুরু ? শেষ যা তা শেষ নয় ? কাজে অকাজে নানাকাজে 'সেদিনের সেই বাঁশি' আমি তো হারিয়ে ফেলেছি, হাবিয়ে যে ফেলেছি—এটা মনেও বুঝি ছিল ! গানের এই লীলাভুবনেই গানহারা উদাসীন ছিলাম প্রবাসীর মত, হঠাৎ এমন সময়, এই 'অবেলায়'—এল লীলাসঙ্গিনী। অবেলায় আবার তবে মাতব খেলায় !

না, লীলাসঙ্গিনীর ডাক ব্যর্থ হবে না, মাততেই হবে খেলায়। পূর্বে যে সব খেলা খেলেছি—তার পুনরাবৃত্তি অবশ্য আর করব না। লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাবের তা ব্যঞ্জনা-ই নয়। লীলাময়ীর আসা মানেই নূতন পথে নূতন হয়ে নূতন রহস্যাভিমুখে চলা। দিনের আলোয় এক খেলা খেলেছি, রাতের

কালো রহস্যের অন্ধকারে আর খেলা খেলব। দুই খেলাই জীবনের খেলা। জীবন শুধু মর্ত্যজীবন, প্রকাশজীবনটুকুই না। তা অমর্ত্যলোকের অপ্রকাশ অসীমত্ব নিয়ে-ও বিদ্যমান। এবার সেই অমর্ত্যলীলার অসীমরস আস্বাদন করব। সেখানের যে-সৌন্দর্য এখনো আমার ধরা হয়নি, লীলাসঙ্গিনী যখন জীবনসন্ধ্যায় এসে দেখা দিল, অবশ্যই নিয়ে যাবে সেই সৌন্দর্যের দিব্যতায়। 'নিশীথ অন্ধকারে' 'অমাবস্যার পার' এবার সন্ধান করব অপ্রাপণীয়ের সঙ্গসুধা। 'মনে মনে' জানব, প্রভাতকালে 'মালতীলতায়' যাকে প্রকাশিত দেখেছি, রাত্রিলোকে তারায় তারায় তারই 'লুকাচুরির' ছন্দোহিল্লোল। যার আনন্দের স্পর্শাশীর্বাদে লোকজীবনে-ও বেজেছিল অমরলোকের সুর—নীরবে, নিভৃতে, কেউ-জানবে-না-এমন-নিভৃতে তাকে লাভ করব এই জীবনে। দিনের প্রকাশজীবনে যাকে পূর্ণভাবে পাওয়া 'দুরাশা' মাত্র, রাত্রির অপ্রকাশ জীবনের অন্ধকারে তাকে পাব, পেয়ে রচনা করব স্বপ্নোপম অমরলোক !

তবে তো এই অবেলায় লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাব-তাৎপর্য স্পষ্ট হ'ল। আর অবেলাই বা বলি কেন ? দিনের ভাষায় এটা অবেলা, কিন্তু সন্ধ্যার ভাষায় এটাই তো অমরলোক-সন্ধানের প্রকৃষ্ট সময়। সন্ধ্যায় লীলাসঙ্গিনীর তো এমনতর-ই রূপ !···তবে তো সন্ধ্যা আসা-ও জীবনের পক্ষে ভাগ্যের কথা। জীবনের সন্ধ্যাকে যে ভয় করি সে তো কেবল জীবনের প্রভাতটুকুকেই একমাত্র সত্য বলে' মনে করি বলে। প্রভাত এলেই আসবে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা এলেই আসবে নূতনতর প্রভাত। সেই প্রভাত হয়তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই লোকায়ত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাকৃত প্রভাত নয়। কিন্তু সে-ও এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিনব প্রভাতলোক, যার বাণীর মন্ত্র এখানকার সূর্য দিয়ে দেখা যায় না, এখানকার ঋতুলীলার রূপোপলব্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। লোকায়ত জীবন সন্ধ্যার পর লোকোত্তর সেই অভিনব প্রভাতে আমার অগ্রগতি। কিন্তু কী করে এটা বুঝতে পারছি ? না, লীলাসঙ্গিনী ডাক দিয়েছে যে ! সে যখন ডাক দেয়, সীমিত জীবনটুকুর অভিজ্ঞতা দ্বারাই বুঝেছি, নূতন কোনো সংবাদ আছে জীবনে জন্মের। তাই সন্ধ্যা যদি এল, রাত যদি আসে, অন্ধকারে

এ-পারের এই চোখ কিছুই যদি আর না দেখে, কান কিছু না শোনে, কোনো ইন্দ্রিয়-ই যদি আপন-আপন কর্ম আর না করতে চায়, ভয় করব না। তাকে আমি চিনি, 'গোপনরঙ্গিনীর' ছলনা আমি বুঝি। অভিনবের মন্ত্র আছে তার আবির্ভাবে, আমি জানি।

যদি রাত হয় না করিব ভয়
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি
হে গোপনরঙ্গিনী।
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিনী।

লীলাসঙ্গিনীর এই অলোকলোকের রসতত্ত্ব মাঝে মাঝে আমাদের এই লোকজীবনে-ও যে অনুভব করি না, তা নয়। সীমার মধ্যে যে অসীম দেখি অথবা রূপের মধ্যে যে অরূপেব ছন্দোনূপুর শুনি তার কারণই এই ঃ অলোকলোকের আলোকাভাস লোকজীবনের চেতনাতে-ও প্রতিফলিত হয়। যে ভাগ্যবানের জীবনে তা হয়, সে-ই জানে কী এর আনন্দ, কী অনির্বচনীয় ধ্বনিমাধুর্য এর ছন্দে।

রবীন্দ্রনাথ এই অলোকলোকের আনন্দাভাস পেয়েছেন 'প্রভাতসঙ্গীতে'র যুগেই। 'তরী'-কাব্যের সময় থেকে এ-আভাস মন্ত্র-প্রত্যয়ের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। 'তরী'-কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রার রূপানন্দে যে-শিল্পসত্যের সূচনা, পূরবী-কাব্যের অলোকলোকের দিব্যানন্দে তার পূর্ণতা। তরী-কাব্যে দিন-জীবনের প্রকাশলীলার রহস্যাভিসারই প্রাধান্য পেয়েছে। সীমাময় জগতের মধ্যেই অসীম যে দীপ্তি আছে—'তরী'-কাব্যের যৌবনোচ্ছ্বাস প্রধানতঃ তার-ই অভিমুখে। পূরবী-কাব্যের অভিমুখিতা জীবনাতীতে তিমিরঘন রহস্যজীবনের আনন্দে। এই আনন্দের দিব্যধ্যানটি মর্মে রেখে পূরবীর স্মৃতি, স্বপ্ন, প্রেম ও

গতি বিচার করলে দেখা যাবে, তত্ত্বের বিচারে 'তরী'-কাব্য যদি দিনজীবনের সৌন্দর্য, পূরবী তবে দিনান্তজীবনের সৌন্দর্যসন্ধান। প্রাপ্তি ও সন্ধান, সেই হেতু গতি—রবীন্দ্রকাব্যাবলীর এই হচ্ছে গোড়ার কথা এবং শেষের কথা। ঠিকমত বুঝতে পারলে দেখা যাবে, বিচিত্রকথা বলা সত্ত্বেও একটি কথাই কবি বলেছেন ঃ অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য তাঁর রচনায় কুত্রাপি নেই। এই হিসাবে তিনি একজন নিত্য স্মরণীয় ক্লাসিক কবি। আবার খণ্ড কবিতার রসবিচারে বৈচিত্র্যের পূজাভাব অনুভব করে' তাঁকে 'রোমান্টিক' বলে' অনুমান করা-ও অস্বাভাবিক নয়। আসলে, 'তরী'-কাব্যের আলোচনায় আমি দেখিয়েছি, মর্মতঃ তিনি ভূমাকেন্দ্রিক বা প্রেমকেন্দ্রিক কবি। * যা কিছু দেখেন ভূমার দৃষ্টিতে, প্রভূতের দৃষ্টিতে দেখেন, প্রেমের বিচারে বোঝেন। প্রেমের বিচারটি এই ঃ যে-শক্তি আমাকে নিয়ে এল এপারে, সে-ও যেমন প্রেম, যে আমাকে নিয়ে যাবে এপার থেকে আনপারে, সে-ও তেমনি প্রেম। প্রেম সর্বজগদ্‌গত। এপার থেকে আনপার পর্যন্ত তার অবস্থিতি।

প্রেম কি না বৃহত্তমেরো বৃহত্তর, তিনি ব্রহ্ম। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি অব্যক্ত অবস্থায় ছিলেন, ঋষিরা বলেন, তাঁ থেকেই ব্যক্ত হয়েছে এই বিশ্বজগৎ। প্রথমে তিনি নিজেকে পুরুষরূপে আবির্ভাবিত করলেন। পুরুষরূপকে এইজন্য সুকৃত বলা হয়। সুকৃতস্বরূপ তিনি-ই রস, তিনি প্রেম। এই প্রেমস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েই জীবলোক আনন্দযুক্ত হয়। তিনি যদি আনন্দস্বরূপ নন, তবে জীবজগতে কেউ কি জীবনধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদনে আনন্দ পায়? তাঁ থেকেই আনন্দ। তাঁকে জানা ও মানা মানে-ই ভয়রহিত হওয়া।

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। ‡

* রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, পৃঃ ৪৪-৪৫, ৫৪-৫

‡ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭

যখন জীব এই ইন্দ্রিয়াতীত রূপরহিত অব্যক্ত ও অমাধার ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন-ই তার আর ভয় থাকে না। তখন—

যদি রাত হয় না করিব ভয়
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাহি দেখি তবু ছলিবে কি
হে গোপনরঙ্গিনী?

ইন্দ্রিয়াতীত ও রূপরহিত হলে-ও তোমাকে চিনি। দিনে তুমি, দিনান্তে-ও তুমি। দিনের প্রকাশলোকে যখন লীলা, তখন নাম যদি মানসী, কি মানস-সুন্দরী, কি স্মৃতিঅবগাহিনী, অপ্রকাশলোকের ব্যগ্রগতির সৌন্দর্যে তবে নূতনতর আর এক নাম, লীলাসঙ্গিনী। বীথিকা-কাব্যে ইনি-ই 'রাত্রিরূপিনী'। 'মরণমাতা' নামে-ও এঁর আর এক পরিচয়।

পূরবী-কাব্যে 'লীলাসঙ্গিনী'কে 'খেলার গুরু-'ও বলতে পারেন। 'খেলা' কবিতাটি স্মরণ করুন ঃ

আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার গুরু
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা?

যে-পথে একবার গেছি তা তো জানা হয়ে গেছে, তা তো 'বাঁধা পথ'। সে-পথে আর খেলব না। নূতন পথে যাব। সন্ধ্যায় তাই নূতন পথে তোমার আহ্বান।

'দোসর'-কবিতাটিরো এই ধ্বনি ঃ

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল, একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়—
তোমার আমায় নতুন পালা হোক-না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

'অদেখা' কবিতায় দোসরের 'বীণা'র সঙ্গে কবির 'বাঁশি'র সুর মিলেছে। কবি তাঁর দর্শন পেয়েছেন দৃশ্যাতীত ভাবের আনন্দস্বাদে :

এসেছে সে, মন বলে এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।
বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মররবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে—
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পথিক ঃ প্রেমবৈরাগ্য

ঘর ও পথ—এই দুই নিয়েই মানুষের জীবন। এ-দুয়ের কোনোটাকেই মানুষজীবনে বাদ দেওয়া চলে না। পথটিকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ঘরকেই যখন সত্য বলে' জানি, ঘরটা তখন পশুর সংকীর্ণ বিবর মাত্র হয়ে ওঠে—অন্ধকার সেই সুড়ঙ্গ-পথে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, বাতাসের চলাচল সেখানে অসত্য, নীলাকাশের অনন্তবিস্তৃত স্বপ্নসত্তার প্রবেশপথ পায় না বলে' বৈচিত্র্যবিহীন গতানুগতিকতা'র প্রাণহীন একটা রোধক-রাজ্য রচিত হয় সেখানে। আবার ঘরটাকে বাদ দিয়ে পথকেই যদি সত্য বলে' গ্রহণ করি, পথের বিশালতা ও অসীমতা সীমাবিশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নেয়ার সুযোগ পায় না, ফলে' সৃষ্টি-বিরোধী একটা উদ্ভট অপ্রাকৃত অবস্থার উদ্ভব হয়। ঘরের তথা স্বদেশের, আরো এগিয়ে বলি, পৃথিবীর, দায়িত্ব গ্রহণ করার তখন মন থাকে না, থাকে না মতি। সন্ন্যাসীর তুরীয় অবস্থার গৌরব দিয়ে সে-ভাবটিকে সম্মানিত করতে পারি, কিন্তু সামাজিক জীবনে, কি মানবিক তথা প্রাকৃতিক জীবনে তা অবশ্যই প্রেরণাপ্রদ নয়, এইজন্য তা সত্য-ও নয়। মানবিকতার তত্ত্বে, একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সংসারে ঘর-ও আছে, পথ-ও আছে। এইজন্য আছি-র সঙ্গে যাচ্ছি-টা এবং যাচ্ছি-র সঙ্গে আছি-টা সত্য।

মানুষের জন্মটার অর্থ হচ্ছে একটা ঘর পাওয়া আর মৃত্যুটার তাৎপর্য হচ্ছে পথে ধাওয়া। কবির ভাষায়, জন্ম যদি 'গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান' মৃত্যু তবে 'পথিকেরে ডাক'।…জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু-ও যেহেতু নবজন্ম, সুতরাং জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিত্য গতি-ই জীবনের সত্যতত্ত্ব। ঘরের প্রেমকে উপেক্ষা না করে-ও পথের আলোয় যার অভিসার, জীবনরসিক তিনি পথিককবি, ঘরের মায়ায় তিনি পথকে দেখেন রূপবিচিত্র, পথের আলোয় তিনি ঘরের বৈচিত্র্যে দেখেন একের আনন্দ। বিচিত্রে এক এবং এক থেকেই বিচিত্র—এই যে

রূপলীলার মহতী মাধুরী—এটি যিনি আস্বাদ করেন, উপলব্ধি করেন, রবীন্দ্রশাস্ত্রে তিনি পথিক।

পূরবী-কাব্যের 'পথিক'-কল্পনার এই তাৎপর্য: জীবন যদি ঘর ও পথ, মানুষ তবে গৃহী ও পথিক।

গৃহ ও পথ—এই দুই তত্ত্বকে কবিগুরু প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্বের ব্যাখ্যাদ্বারা বেশ চমৎকার ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন:

> 'ঋষিরা বলেছেন, আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তাঁর সেই একা-একা ভাবটি আর ভালো লাগলো না। তিনি সঙ্গী খুঁজলেন! সেই অদ্বিতীয় পুরুষ সঙ্গী পাবেন কোথায়? তাই তিনি আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রকৃতি-পুরুষ এই দুই রূপেই হোলো আদিবৈচিত্র্য। এরা দুযেই পরস্পরকে চায়। এদের কেউই একা পূর্ণ নয়, দুই দুয়ের অপেক্ষা রাখে।
>
> ·পরমাত্মা যখন একা ছিলেন তখন কোনো বালাই ছিল না। যেই প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ নরনারী ভাগ হোলো তখন হতেই যত দুঃখবেদনা। পুরুষ হলেন শুদ্ধমুক্ত স্বভাববান। অথচ প্রকৃতি তাঁকে না বেঁধে ছাড়বেন না। প্রকৃতি মাতৃরূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, প্রণয়িনী রূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, কন্যারূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন। পুরুষ যদি তাতে ধরা পড়লেন তবে ঘুচলো তাঁর মুক্তি। আর পুরুষ যদি ধরা না পড়লেন তো প্রকৃতির বেদনার আর অন্তই নেই। পুরুষকে বাঁধতে গিয়েই প্রকৃতির যত সৌন্দর্যলীলা যত রূপগীতগন্ধরসস্পর্শ বৈচিত্র্য। এই সবই প্রকৃতির অনুনয়। এই অনুনয়ে বাঁধা পড়লে মুক্ত পুরুষ হন বদ্ধ। তখন পুরুষের ব্যাকুল বেদনা জাগে মুক্তির জন্য।···
>
> জীবাত্মা এই সংসারে আসে অনাসক্তরূপে। অনাসক্তরূপেই সে যায়। ···মুক্ত সাধক···সাধনার জন্য সংসারে থাকলেও···বাসা বাঁধেন না। মানসলোকের ডাকের জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকেন। *

এই প্রতীক্ষাই মানুষকে দান করে পথিকের গৌরব। পথিক হতেই মানুষের আসা। পথ চলাই তার ধর্ম, কর্ম। চলছে সে, চলছে অবিশ্রান্ত

* বলাকাকাব্যপরিক্রমা, পৃঃ ১১।১২

গতিরঙ্গে : ঘরের বন্ধন থেকে পথের মুক্তিতে, প্রভাতের বৈচিত্র্য থেকে সন্ধ্যা-তিমিরের একত্বে। চলছে সবাই, কেউ অজ্ঞানে, কেউ সজ্ঞানে—জন্মের প্রকাশ থেকে মৃত্যুর অপ্রকাশে, সেখান থেকে অন্যতর সূর্যজন্মের কোনো জ্যোতিঃপ্রকাশে।

এ তত্ত্ব যদি সহজে বুঝি তবে অবশ্য কোনোই গোল থাকে না। তখন বুঝতে পারি, সংসারে কিছুই ধরে রাখার নয়, আমার আমি-টিকে-ও ইচ্ছা করলে যে ধরে রাখতে পারি, তা নয়। আসলে ধরে-রাখার কথাটাই অবাস্তব, অপ্রাকৃত।

অবশ্য ধরে-রাখার বাসনা যে নেই তা তো নয়। আছে, খুব করে আছে। অন্তরের মধ্যে ওই প্রকৃতিটি আছে যে। ঘর আছে যে। সীমাবিশেষে আছি, আসক্তি তাই নয় হবার নয় সহজে। কিন্তু পুরুষটি-ও আছে বলে' পথের মুক্তি চাই-ই চাই। প্রকৃতির অনুনয় কি ঘরের বন্ধন বেশিদিন তাই জীবনকে বেঁধে রাখতে তো পারে না।

> সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ, অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে-ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরমগতিতে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি। *

এই 'মহতী বিনষ্টি' থেকে সজ্ঞানে যদি বাঁচতে না চাই, তবু বাঁচব, কেননা মৃত্যু আছে মিত্রের মত আমাদের শিয়রে। মোহোন্মত্ত বিকারগ্রস্ত আমাদের মন সীমাবিশেষের বন্ধনে যদি বাঁধা পড়ে থাকতে-ও চায়, যথাকালে মৃত্যু এসে আমাদের মুক্ত করে, পথিকত্বের রক্ততিলক পরিয়ে দেয় ললাটে।

* পথের সঞ্চয়, পৃঃ ৬৭।৬৮

জ্ঞানে যখন এটা বুঝতে পারি, মৃত্যুর আসার আগেই মৃত্যুরসের আনন্দ করি আস্বাদ। তখন এই গান:

তোরা বলেছিলি তাকে,
'বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়'।
ঝড় বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে—
'নয়, নয়, নয়।'
—ঝড়।

নয় যদি, তবে কী? না, বাসা নয়, পথ। অন্ধ বাসনা নয়, গতির আনন্দ। তাই পশ্চাতের কীর্তি অথবা ভবিষ্যতের পার্থিব আশা যতই মোহময় হ'ক—তার মধ্যে বাসা বেঁধে মৌরস পাট্টা গেড়ে বেঁচে থাকতে চাওয়ার মত মূঢ়তা আর নেই।

তবে করব কী? না,

নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর।
—ঝড়।

বলাকা-কাব্যে এ-তত্ত্ব, এ-মনোভাব নানা কবিতায় নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর গতিবেগে অনন্ত পথে অগ্রগামী জীবনের চাঞ্চল্য বলাকা-কবিতাবলীর ব্যঞ্জনা। তবু বলি বলাকার মৃত্যু গতি-জীবনের একটি তত্ত্বমাত্র।

ব্যাখ্যার দ্বারা সে-তত্ত্ব-স্বরূপের অন্তর্দেশে প্রেম ও বৈরাগ্য আবিষ্কার করা যে অসম্ভব তা বলি নে, কিন্তু স্পষ্টতঃ বলাকার মৃত্যু পূরবীর মৃত্যুর মত শিল্পসৌন্দর্যের আনন্দ-বাদিতায় প্রত্যক্ষভাবে রসমধুর নয়। আসলে মৃত্যুর টানে জীবন যৌবনময় ও নিত্যনবীন—এই তত্ত্বসত্য বলাকায় এমনি উচ্ছলবেগে অভিব্যক্ত হয়েছে, যে মৃত্যুর ভূমিকায় জীবনের প্রেমপ্রীতি ও মায়ামমতার লোকায়ত ভাবাবেগগুলি নূতনতর কেমন রূপ ধারণ করে, কেমন তাদের সুর ও স্বপ্ন বিধি ও বিলাস—এ-সব তত্ত্ব সম্বন্ধে বলাকা-কবির অন্তরে আদৌ কোনো প্রশ্ন জাগে নি। রসসুন্দরের অমিত ঔজ্জ্বল্যে মৃত্যু যে কত মহিমময় এবং সর্বোপরি মৃত্যুর ভাবাবেগে জীবনের বাস্তব প্রেম যে কত মুখর ও প্রখর —পূরবী-কাব্যেই তার সচ্ছল ও সচ্ছন্দ প্রকাশ দেখেছি। 'বলাকার পর' পূরবী-কাব্যের নূতন 'সূত্র'টি হচ্ছে * সন্ধ্যার আনন্দে জীবনচৈতন্যের প্রভাতময় হার্দ্য অনুভূতি, এবং মৃত্যুর ভূমিকায় প্রেমায়ত স্বপ্ন ও স্মৃতিবেদনার গীতিমধুর অভিনবতা!

বলাকার প্রতিপাদ্য জীবনের গতিবেগ; পূরবীর বক্তব্য—জীবনের বেগেই এসেছে জীবনসায়াহ্ন, যা জীবনপ্রকৃতির অবলুপ্তি নয়, নবতর প্রারম্ভ। প্রভাত থেকে সায়াহ্ন, সায়াহ্ন থেকে রজনী, রজনী থেকে নবতর প্রভাত—এ গুলিকে যদি জীবনপথের এক একটি মোড় বলে' কল্পনা করা যায়, তবে পথিকমানব অহরহ এই পথের মোড়ে আসছে, মুহূর্তেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে এ-মোড় থেকে সে-মোড়ের দিগন্তে। তবে কথাটি এই: যে-মোড়ে সে আসছে প্রেমবোধের দীপ্ত চেতনায় জাগিয়ে দিচ্ছে পথবাসী বন্ধুসমাজকে, কিন্তু মুহূর্তকাল থামছে না কোথাও।

বলাকার নিত্য চলার নৃত্যরঙ্গের সঙ্গে পূরবীর পান্থ-লীলার প্রেমস্বপ্নটির পার্থক্য কোথায় যদি জানি, তবেই বুঝতে পারি বলাকার পর পূরবীর নূতন সূত্রটি কী এবং কোথায়।

* শ্রীপ্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, পৃঃ ৩০ দ্রষ্টব্য।

চলছি এবং চলব, এই বলাকা। চলছি আদিজন্মভূমে, 'জ্যোতির্ময়ী'র পূর্বসন্নিধানে, কিন্তু যেতে-যেতেও জ্যোতি হচ্ছি, সীমিত আকাশটুকুতেই জ্বালছি আলো, মেলছি সপ্ত রঙ, প্রাণের রঙ, গানের রঙ, ধ্যানের রঙ,—এই পূরবী।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম শুধু 'বলাকার' গান নয়, 'পূরবী'র ধ্যান-ও বটে। ছাড়ার কথাই সত্য, কিন্তু ছাড়ার চেতনার মৌনে ধরার বেদনাটি কি নেই প্রচ্ছন্ন? না-ই যদি ধরলাম, ছাড়লাম তবে কী এবং কাকে? তত্ত্ব-বিচারে ধরার কথা যদি তেমনতর সত্য না-ও হয়, ধরতে-ধরতে ছাড়তে-ছাড়তে বাড়তে-বাড়তে যাওয়ার কথা যে সুন্দর সে বিষয়ে তো কোনোই সন্দেহ নেই।

পূরবী তাই ধরার কথা, ছাড়ার কথা, বাড়ার কথা—কেননা, পূরবী হ'ল প্রেমের কথা। পথিকপ্রেমের মঙ্গলতত্ত্ব এ-কাব্যের শিল্পচেতনা।

রবীন্দ্রশাস্ত্রে প্রেম, সুধীসমাজ জানেন, এক হিসাবে বৈরাগ্য-ও বটে। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' রবীন্দ্রনাথের নয় এই অর্থে, যে, যে-বৈরাগ্য মানবিক স্বপ্ন ও স্মৃতির আনন্দ সম্বন্ধে উদাসীন, যে-বৈরাগ্য জনসমাজের বহুদূরে নির্জনে বিজ্ঞানানন্দের কি না আত্মমোক্ষের ধ্যানে সাধককে সমাধিস্থ করে, সেই যোগবৈরাগ্য, সন্ন্যাসবৈরাগ্য, রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই নয়। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে বৈরাগ্য হচ্ছে তুচ্ছে বিরতি, উচ্চে রতি। বলা বাহুল্য প্রেম-ও সেই বস্তু। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় প্রেম ও বৈরাগ্য পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব নয়, একে অপরের পরিপূরক, অনেক ক্ষেত্রে সমার্থ-ব্যঞ্জক গতিতত্ত্ব। 'কণিকা'-কাব্যের একটি চারি-পংক্তির পদ্যে এই তত্ত্বটি কবিগুরু বেশ স্পষ্ট-ই করে দিয়েছেন:

> প্রেম কহে, হে বৈরাগ্য তব ধর্ম মিছে।
> প্রেম, তুমি মহামোহ, বৈরাগ্য কহিছে:
> আমি কহি ছাড় স্বার্থ মুক্তিপথ ত্যাখ।
> প্রেম কহে, তাহ'লে তো তুমি-আমি এক॥

প্রেম ও বৈরাগ্য রবীন্দ্রশাস্ত্রে, বোঝা গেল, এক অদ্বয় বস্তু। বৈরাগ্যের মত রবীন্দ্রপ্রেম-ও তুচ্ছে বিরতি, উচ্চে রতি। যদি তুচ্ছে রতি তবে তা 'মোহ, তা বন্ধন। মুক্তিপথে, চলার পথে তা বিঘ্ন। তা অন্তরায়।

যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না, পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে-প্রেম তো রিপু। এক পক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে, অন্য পক্ষকে লালায়িত আসক্তির দ্বারা লেহন করে জীর্ণ করে দেয়। *

মোহপ্রেম তাহ'লে প্রেম নয়, বৈরাগ্যপ্রেমই প্রেম। সে-প্রেম সম্মুখে পথে চলতে জানে, চালাতে জানে। নিত্য গতি তার। অথচ প্রেম কি না, তাই সবার ওপর-ই তার মমত্ববোধঃ বিশ্বের কল্যাণে তার চিন্তা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তার আনন্দ, অন্তরঙ্গের দুঃখে তার বেদনা, প্রিয়জনের বিরহে তার ব্যাকুলতা। স্মৃতির সহস্র বন্ধনে সে আসে; অসংখ্য বন্ধন মাঝে-ও মুক্তির স্বাদ পায়, টলে, তবু চলে। এটা কেমন করে সম্ভব হয়? না, বৈরাগ্য-ও রয়েছে যে। প্রেম যদি বিশেষে আসক্ত হয়ে মোহ হতে পথ চায়, বৈরাগ্য তাকে টানে, তুলে নেয়, বন্ধনমোচনে দেয় সহায়তা। আবার বৈরাগ্য যদি উদাসীন শূন্যতায় উড়ে যেতে চায়, প্রেম আছে যে, শূন্যতার বিমর্ষভাব দেয় ঘুচিয়ে, উদাসীন বিরাগী মনে লাগায় স্বপ্নস্মৃতির সপ্তরঙ। গান গাওয়ায়। মায়াঞ্জন পরায় চোখে।

রবীন্দ্রবৈরাগ্যে উপেক্ষার বাণী মিথ্যাঃ তা নেমে আসে প্রেমের টানে। রবীন্দ্রপ্রেমে মোহ মিথ্যা, তা অগ্রসর হয় বৈরাগ্যের আনন্দে। এই জন্য রবীন্দ্রতত্ত্বে দিতে-চাওয়ার বেদনা-ই সত্য, নিয়ে-যাওয়ার কামনা সত্য নয়। নিতে-চাওয়ার মধ্যে আসক্তি, মোহ। দেয়ার মধ্যে, না-পেয়ে-ও দেয়ার মধ্যে, মুক্তি-মঙ্গলের আনন্দ।

পূরবীর 'বাতাস'-কবিতাটিতে এই আনন্দের আভাস।

'বাতাস' কবিতাটি তেমন বিখ্যাতি পায়নি। কিন্তু কবিতাটি ভালো। রূপক কবিতা। পথিকপ্রেমের মঙ্গলতত্ত্ব এ-কবিতার ধ্বনি।

কবিতাটিতে পাখা আছে, ফুল আছে, নদী আছে, অরণ্য আছে। তারা

* রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, যাত্রী, পৃঃ ৪৩১

সবাই বাতাসকে প্রশ্ন করছেঃ কী তুমি চাও, কী তোমার কথার মর্ম, আর বাতাস ধীরভাবে উত্তর দিচ্ছে সব প্রশ্নের। গোলাপ, পাখী, নদী ও অরণ্যের প্রশ্নগুলি মানবিক প্রশ্ন-ই বটে। বাতাস যদি কবির গান, ফুলপাখীনদীঅরণ্য তবে মানব-সাধারণের অবোধ প্রশ্ন।

বাতাস এসে ফুলের ঘুম ভাঙায়, পাখীকে দান করে আকাশের স্বপ্ন, নদীকে জানাতে আসে সাগরের তরঙ্গছন্দ, অরণ্যে জাগিয়ে যায় বসন্তের মন্ত্রবাণী—তবু বাতাসকে স্পষ্ট করে কেউ-ই বোঝে না। সবাই প্রশ্ন করেঃ তোমার তত্ত্ব পারি নে বুঝতে; কী তুমি বলতে চাও, যাও না বলে' স্পষ্ট ভাষায়।

বাতাস গোলাপকে বলেঃ আমার জীবনতত্ত্ব যদি না-ই বোঝ, বুঝো না। কিন্তু আমি বুঝি কার স্পর্শে তুমি পুলকিত হয়ে উঠতে চাও। তাই প্রভাতের আলো যেই আকাশে জাগে আমি বেগে বয়ে আসি তোমার কাছে, ঘুমুচ্ছ তুমি, জাগিয়ে দিই তোমাকে। তুমি জেগে ওঠো আমার-ই আহ্বানে, তারপর প্রভাতের সঙ্গে যখন তোমার লীলা চলে, হয়তো তখন ভেবেও দেখ না, কে তোমাকে ডাক দিয়ে জাগিয়েছে। আমি দূরে চলে যাই এই আনন্দেঃ আমার ডাক ব্যর্থ হয়নি তোমার যৌবনে।

পাখীকে বলে বাতাসঃ আমার ভাষা না-ই বা বুঝলে, আমি তো তোমার ভাষা বুঝি। তাই তো তোমার প্রয়োজনে আমাকে আসতে হয়, তুমি যার সন্ধান করো অবচেতনার স্বপ্নান্তরালে, তার সন্ধান দিতে হয় এনে। আকাশে তোমার প্রেম, আমি জানি। তাই আকাশে যেই জাগে আলো, আসি ছুটে, দিই 'সীমাহীনের বাণী'। বাণীর স্বপ্নসুরে যখন তুমি আকাশচারী, দুঃখ কি, তখন যদি আমার আহ্বান-বাণীর প্রশংসা তুমি না করো। আকাশ তুমি পেয়েছ, গিয়েছ তার সুরময় ধ্যানের সুনীল আনন্দে, এতেই তো আমার সার্থকতা।

নদীকে বলে বাতাসঃ জানি নদী, কার মাঝে আত্মসমর্পণ করে' পরমগতি তুমি পেতে চাও। তোমার তরঙ্গের নৃত্যতালে সাগরের ছন্দ দোলাতে আসি

—সে তো সেইজন্যে। সাগরাভিসারিকা তুমি, আমার কথা বোঝ আর না-ই বোঝ, স্বভাবের আবেগে আমার গানের মর্ম তো কাজে লাগাও। এই তো গৌরব, এই তো গানের মুক্তি।

অরণ্যকে বলে বাতাস ঃ জানি আমি বসন্তের সন্ধান করো অন্তরে। বসন্ত যখন পথে এল, আগে থাকতে তার মন্ত্র তাই এনে দিই তোমার কানে। শীতার্ত তুমি, বুঝতে পারো না আমার গানের মন্ত্র, কিন্তু জেগে তো ওঠো বসন্তের অভিসারে! বুঝেছ বলে' সম্মান আমাকে না-ই বা দিলে, জেগে উঠেছ বলে আনন্দ তো পাই!

পথিক আমি, পথে-ই আমার জীবন। পথ চলতে যে-গান গাই, সেই গানের সুরে যদি প্রাণ পাও, জানবে আমি প্রেম ঃ অজানার আভাস দিতে আসাই আমার লীলা। আভাস পেয়ে যদি চমকে ওঠো, ধ্যানে ছোটো, রাঙিয়ে ওঠো প্রাণে—তবে তো ধন্য আমি, সেই ধন্যতাই আমার আনন্দ, পথ-চলার পরম আনন্দ।

এ-প্রসঙ্গে 'পথ' কবিতাটি, স্মরণ করলে মন্দ হয় না। বলা হল, পথ-চলার যে-আনন্দ-লীলা, যোগবিজ্ঞানীরা তা' ঠিকমত জানেন না, কিন্তু শিশু ভোলানাথের দল জানে। বিধাতার মত সরল, সুন্দর ও নির্মম এই শিশু ভোলানাথের দল, 'লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে'—পথের ধূলি নিয়ে গড়ে খেলাঘর, ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে করে লীলা, মুহূর্তে আবার ঘর ফেলে, ঘর ভেঙে আনঘরে যাওয়ার জন্যে হয় চঞ্চল।

কবি এই শিশু ভোলানাথের মত নিত্যানন্দ। 'পথের' 'সর্ববন্ধহীন' নিত্য চলার ছন্দটি তিনি ধরেছেন।

পথ-কবিতাটি-ও রূপক।···দূরে, বহু দূরে, দেশে দেশে নানা দেশে ভ্রমণ করার পর পথটি, রাজপথটি, দুয়ারের বাইরে এসে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

দুয়ারের পরেই ঘর। সেই ঘরে প্রবেশাধিকার নেই পথের। ঘরের মধ্যে· যা হচ্ছে তারই অর্থহারা ছিন্ন অংশ মাঝে মাঝে ভেসে আসে পথে, সেই ঘরের (বুঝি অগম-ঘরের?) প্রাণশক্তি থেকে পথের ধূলিপটে অঙ্কিত হয় 'দীপ্ত রশ্মিরেখা'। তাই দেখে মত্ত হয় মন, অসম্পূর্ণ সেই 'রেখা' পাঠ করে' ঘরের রহস্য জানতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু ইচ্ছা হয় না সফল।

মানুষের জীবনটা বুঝি এই পথের-ই মত। আমরা কর্ম করি, ধর্ম করি, গান গাই, শিল্প করি রচনা। জীবনের অন্তরালে গভীরতম কী রহস্য আছে প্রচ্ছন্ন, আমরা তা জানি না। কিন্তু সেই গভীরতম রহস্যভূমি থেকে কিছুটা রশ্মি যেন দেখতে পাই। তখন বুঝতে পারি—গভীরের সেই উৎস-ভূমির প্রণোচ্ছ্বাসেই বহিঃপ্রকৃতির এই আলো, এই রূপবিলাস।

'বিচিত্রের প্রয়োজনে' এই মানবজীবন, আসলে কিন্তু 'অবিচিত্র শূন্যময়' তার আত্মা। 'সর্ববন্ধহীন' সে, অসংখ্য রূপবন্ধনের মধ্য দিয়েই 'ভবিষ্যতের পানে' সে চলে।···মানবজীবনে স্নেহ, মমতা, বেদনা, আর্ততা—এগুলি যেন বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্রের আনন্দলীলা।

বিচিত্রের প্রয়োজনে প্রেম, অবিচিত্রের উদাসীন আনন্দে বৈরাগ্য। রবীন্দ্রশাস্ত্রে প্রেমবৈরাগ্যের তত্ত্বটি এই। এটি বুঝলে তাঁর পথিকতত্ত্বটি স্পষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোজীবনের দ্বন্দ্বটি আর প্রহেলিকা বলে' মনে হয় না। তাঁর কথাগুলি ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা-ও তখন সহজ হয়। তখন বোঝা যায়—যাবার-বেলায় কেন তিনি ফিরে-আসার বেদনায় প্রীতিপ্রশান্ত, প্রত্যাবর্তনের আনন্দ-ছন্দে-ও কেন তিনি অগ্রগমনের চেতনায় গীতিপ্রসন্ন।

> 'আমি চঞ্চলের লীলাসহচর। আমি কী করেছি, কী রেখে যেতে পারব, সে-কথা জানি নে। স্থায়িত্বের আব্দার করব না; খেলেন তিনি কিন্তু আসক্তি রাখেন না; যে-খেলাঘর নিজে গড়েন, তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যা-বেলায় এই আম্র-কাননে যে আলপনা দেওয়া হয়েছিল, চঞ্চল তা একরাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নূতন করে আঁকতে হল। তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করি নে। ভাঙা খেলনা

আবর্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রস-ও ফুরোবে। ভাঁড়-ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ তো দেউলে হবে না।' *

অর্থাৎ লীলায়োজনের শেষ নেই, শেষ হবে না কখনো। যতদিন আছি, লীলাসহচর আমি চঞ্চলের, আবার যাব যখন, চঞ্চলের মত সব ফেলেই যাব চলে'।

পথিকতত্ত্বের এই প্রেমবৈরাগ্য একাসনে অদ্বৈত ভাবে উপবিষ্ট হরগৌরীর মত মধুর শিল্পরসে প্রমুদিত হয়েছে পূরবী-কাব্যে। অবশ্য এই তত্ত্বভাব রবীন্দ্ররচনায় যে সম্পূর্ণ নূতন, তা নয়। বলা ভালো, রবীন্দ্রকাব্যাবলীর সৌন্দর্যতত্ত্ব এই-ই। তবে পূরবীতে এই তত্ত্বরস যেমন বিশিষ্টতা পেয়েছে অন্যান্য কাব্যে তেমন নয়। বলাকাকাব্যেব গতিতত্ত্বে রাঙিয়ে-যাওয়ার কোনো বেদনাবোধ নেই ঃ সে-গতি এমনি দুর্বার গতি, যে, পথে পথে কোথায় কী রেখে গেলাম, কী রঙের খেলা খেললাম, কার হাতে দিলাম হাত—সে-সবের চিন্তা মাত্র সেখানে নেই। পলাতকা-কাব্যের গভীরার্থ বাদ দিয়ে স্পষ্টার্থটুকু যদি গ্রহণ করি—তবে সে-কাব্যে হাতে হাত-দেয়ার বেদনবোধটি আছে বটে ; কিন্তু অগম অতীন্দ্রিয় লোকের সৌন্দর্যাস্বাদ সে কাব্যের বিষয় নয়, বক্তব্যও নয়। মর্ত্য-জীবনের বেদনলীলা ও স্বপ্নজীবনের চেতনাভিসার—এই দুই মানসতত্ত্ব এক এবং অদ্বয়ভাবে শিল্পায়িত হয়েছে পূরবীকাব্যে। বলাকার পর তাই পূরবী রচনার আয়োজন ছিল—তত্ত্বসত্যের জন্য তো বটে-ই, রসসৌন্দর্যের জন্য-ও বটে ঃ উদ্দাম গতিবেগে আমরা চলেছি সত্য ; থাকতে আসিনি, রাখতে আসিনি কিছুই—এ-ও সত্য কথা, কিন্তু মনোজীবনে তার জন্য যে কোনোই বেদনাবোধ নেই—তা তো সুন্দর কথা নয়।···যেতে হয়, যেতেই হয়—এই হ'ল বেদনার আনন্দ, বলতে পারেন, এই প্রেম। যেতে পারি, না যেয়ে পারি না—এই হল চেতনার আনন্দ, বলতে পারেন, এই বৈরাগ্য। না যেয়ে পারি না—এই ভাব যদি বলাকার, যেতে হয়, আহা, যেতেই হয়, এই ভাব তবে

* আত্মপরিচয়, পৃঃ ৮২

পলাতকার। বলাকা যদি ব্যাপ্তির সৌন্দর্য, পলাতকা আর্তির, পূরবী তবে গভীরতার মাধুর্য—যার মধ্যে ব্যাপ্তি ও আর্তি অদ্বৈত শিল্পমহত্ত্বে নবপ্রাণনায় সমাহিত।

জীবনগভীরের অখণ্ডতত্ত্ব অর্থাৎ প্রেম ও বৈরাগ্যতত্ত্ব প্রমুদিত হয়েছে পূরবীকাব্যে। কাব্যখানিতে 'পূরবী' ও 'পথিক'—এই দুইভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য তবে স্পষ্ট হ'ল। অবশ্য এ-কথা সত্য, সূক্ষ্মবিচারে এই দুই অংশেরই এক কথা: পূরবীতে সন্ধ্যার সান্ত্বনায় প্রভাতের সূর্যাকাশ, পথিকে ভৈরবীর গতিরাগে নবজন্মের সুরলোক!

সংক্ষেপে, সহজ ভাষায়, পূরবী-কাব্যের পূরবী ও পথিক—এই দুই অংশেই পথের সন্ধান। পূরবীতে কবি পথের সন্ধান পেয়েছেন, অন্ততঃ এইটুকু পেয়েছেন, গন্তব্যপথে নিয়ে যাবেন যিনি, তিনি আসছেন, এবং কবিও কর্মে, ধর্মে, ভাবে ভাবনায় অহরহ তাঁরই পথে যাচ্ছেন। 'অনন্ত' এখনো 'দূরে আছে মায়াচ্ছন্ন লোকে'—কবি তাকে খুঁজে অবশ্যই বার করবেন, নিখিলরূপজগতের আদিভূত প্রাণশক্তিটির জন্য তাঁর গতি, তাঁর সন্ধান (ক্ষণিকা) 'ভোগের পথে' 'বাসনার' পথে তার সন্ধান মিলবে না, সন্ধান মিলবে না স্বার্থ-'উপাসনা' বা 'অভিমানের' দম্ভে, 'সরল প্রেমের সহজ প্রকাশে' তার আভাষ, ভাবঘন নিবিড় মৃত্যুমৌনের প্রশান্তিতে তার 'পরম অপরূপ' রূপপ্রকাশ (প্রকাশ) আজ-ও যে তাকে পূর্ণ-ভাবে জানি না, তার কারণ—আজ-ও মানবজীবনে তার 'গুপ্তদ্বার' আছে চাবি-বন্ধ। সেই চাবিটির সন্ধানে-ই তো পথিকজীবনের অভিযাত্রা। চাবিটি পেলেই জীবনের রহস্যদ্বার খোলা সম্ভব হবে। (চাবি) এখনো তা খোলাই হয় নি, তাই বহির্বিশ্বের রূপরসগন্ধপূর্ণ ও গান নিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়েছে মানুষকে। রূপের অতীতে, গীতগন্ধরসের অতীতে যে অপরূপ, যে মহাপ্রেম নিত্য লীলাময়, প্রকৃতজগতে তাঁর আভাসটুকু-ই মাত্র পাওয়া যায়, তাতে ব্যাকুলতা-ই বাড়ে, ক্রন্দন ঘনায় অন্তরে। (লিপি) সান্ত্বনা এই: দিনজীবনের প্রাকৃতলীলা শেষ হলেই অগমলোকের সেই স্বপ্নরহস্যের আনন্দদ্বারে পৌঁছানো সম্ভব হবে। 'দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ'—কবি তাই গাইলেন 'সাবিত্রী'

কবিতায়ঃ 'শান্তি-অভিষেক হক' এইবার, দিনজীবনের 'সকল আবেশ' ধৌত হয়ে যাক, 'দিনান্তসংগীতধ্বনি'র অধিকারী হওয়ার সময় হ'ল।

পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য কবিতা—এই সাবিত্রী। আমার পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধাদৃষ্টি, কি জানি কেন, এ কবিতাটিতে তেমন পড়ে নি। অথচ ভাবের-গাম্ভীর্যে এবং শিল্পের প্রকাশনৈপুণ্যে অনবদ্য সুন্দর কবিতা—সাবিত্রী। কবিগুরুর দশটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার নাম যদি আমাকে করতে বলা হয়, তবে নিঃসংশয়চিত্তে সেই দশের মধ্যে প্রথম সারে-ই আমি সাবিত্রীকে রাখব।

একজাতের কবিতা আছে ব্যাপ্তির সৌন্দর্য তার প্রাণ; অন্য এক প্রকার কবিতাও পেয়েছি গভীরত্বের মাধুর্য যার আনন্দ। সাবিত্রী এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা।

অগমের শঙ্খধ্বনি এর ছন্দে—এটা বলব না। বলব, দিনান্তসৌন্দর্যের অপার বিস্ময় এর ব্যঙ্গ্যার্থের অগম মৌনে। কিন্তু তাতেই কি তৃপ্ত হলাম?··· কী করে' বোঝাই সাবিত্রী কী?

নিস্তব্ধ নিশীথের গভীর অন্ধকারে ঘুম যদি কখনো ভেঙে যায়, স্বপ্নগম্ভীর আপনি, বাতায়নপথে একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করুন। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না বলে' শয্যাশিয়রে আলো জ্বালুন, জ্বালুন একটি মাটির প্রদীপ। অস্পষ্ট ম্লানালোকে মনে মনে প্রথমে, উদাত্তকণ্ঠে তারপর, পাঠ করুন কবিতাটিঃ আকাশের অপার রহস্য স্পর্শ করবে আপনার মর্মদেশ। অর্থাৎ তুচ্ছ সেই মাটির প্রদীপালোকেই উচ্ছ্বসিত হবে অনন্ত বিস্ময়ের রসলোক —যেখানে সমাহিত আছে আপনার জন্মপূর্ব রহস্যের ইন্দ্রিয়াতীত স্বর্গবহ্নি; সমাহিত আছে আপনার ইহজীবনের অতীতকীর্তি, বর্তমানসাধনা, ভবিষ্য-সান্ত্বনা; সমাহিত আছে, আপনার মৃত্যুগত মহাজীবনের অমৃতশান্তি। অখণ্ড-জীবনের আনন্দপূর্ণতায় অবগাহন করে' সমাধিস্থ আপনি নিঃশব্দের অভিমুখে বসে থাকুন কৃতাঞ্জলি। রাত কেটে যাক, ঊষা এসে প্রভাতের আগমনবার্তা

জানাক, সূর্য উঠুক পূর্বাদ্রির উদয়শিখরে—ভাঙুক আপনার স্বপ্নসমাহিত ভাবসমাধি, বুঝুন সাবিত্রী কী!

সাবিত্রী সূর্যশক্তি ঃ সূর্যমণ্ডলসংস্থিতা তিনি 'জ্যোতির কনকপদ্মাসনা'। 'উদ্‌বোধিনী বাণী'-স্বরূপা তিনি, সূর্যহৃদয়ের প্রেমপদ্মে তিনি বিরাজমানা। তাঁর-ই সুর ও প্রেম থেকে এই বিশ্বজগৎ—বিশ্বজগৎ তাই নিত্যকাল সুরসমন্বিত। বিশ্বনৃত্য তাই অহরহ ছন্দে লয়ে তালে প্রমুদিত।

তার-ই সুর ও স্নেহ থেকে জীবকবির জন্ম, অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, তমসা থেকে জ্যোতির পথে তার অভিযাত্রা।

সূর্যশক্তিতে যে-সুর, মর্ত্যলোকে মানবচিত্ত—তথা কবিচিত্ত সেই সুরেরই প্রতিভূ।...সূর্যশক্তি সাবিত্রীর লীলাবিলাস এই জগৎ চরাচরে, কবিচিত্ত-ও তাই রূপে রূপে দেখে অরূপরহস্য, বর্ণে বর্ণে দেখে অযুত স্বপ্ন।

জন্ম-াময় থেকেই সাবিত্রীশক্তির অর্থাৎ প্রকাশশক্তির আনন্দ নিয়ে মানুষের অগ্রগতি। জন্মপ্রভাত থেকে জীবনমধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে জীবনসন্ধ্যা পর্যন্ত অহরহ অগ্রগতি মানবজীবনের। এই অগ্রগতির পথে শোকে, তাপে, মোহে, দুঃখে ছেদ পড়ে, বাধা পড়ে বলে' মনে হয় বটে, কিন্তু সেটি ভ্রম মাত্র। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মানুষ চলেইছে—প্রভাত থেকে সন্ধ্যায়।

চলাই যদি সত্যতত্ত্ব—তবে সকাল থেকে সন্ধ্যায়, জন্ম থেকে মৃত্যুতে অগ্রগতির ব্যাপারে সন্ত্রস্ত হওয়া অর্থহীন, তাৎপর্যবিহীন।

সূর্যদেব এটি জানেন। প্রেমিক তাই বৈরাগ্যের আনন্দসাধক। তাই তাঁর জ্যোতিপ্রতিভায়, কর্মপ্রতিভায় নিত্য অনাসক্তি। প্রকৃতির অঙ্গপ্রতঙ্গে কত রূপচিত্র তিনি অংকন করেন, তাঁর 'দূতীরা' 'ভুবন অঙ্গনে' কত সৌন্দর্যের 'আলিম্পনা' করে রচনা—কিন্তু অংকনের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে সে-রূপের 'ইন্দ্রজাল' 'মুছে যায় সরে'। না মুছতে জানলে নূতন করে আঁকার তো আনন্দ জাগে না শিল্পচেতনায়।

মানুষের জীবনে তত্ত্বের বাণীটি তবে কী? না, মানুষের জীবনে, তার

হৃদয়াকাশে রূপদূতীর আলিম্পনার মত-ই কত হাসি-কান্না, কত ভাবনাবেদনার রেখাচিত্র হয় অংকিত। মানুষ যদি শুধু জীবমানুষ, তবেই সে হাসিকান্নার রেখাবন্ধনে মোহবন্দী, তবে সে বিভ্রান্ত। কিন্তু সে যদি পান্থমানব, তবে রূপ-দূতীর মত-ই শোকতাপ-ভাববেদনাকে রূপশিল্পের রচনাক্ষেত্রে কাজে লাগায় মাত্র, তারপর তা' পশ্চাতে ফেলে দূরে হয় অগ্রসর, চলার বেগে নবীন কোনো শিল্পরূপের সন্ধানে। পান্থমানবের মন 'আলোর কাঙালী'—সাবিত্রীর বহ্নিসভায় তার গতি। অসতের মোহে নয়, সতের প্রেমে তার মন ; তমসার অহংকারে নয়, জ্যোতির আনন্দে তার অভিসার ; মৃত্যুর অজন্মা ভীরুতায় নয়, অমৃতের নবজন্মে তার অধিকার।

সেই অধিকারের দ্বার এবার তবে উন্মুক্ত হ'ক—সাবিত্রীপ্রার্থনার এই ধ্বনি :

> দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
> তুলে লও তারে।
> শান্তি অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
> অগ্নি-উৎসধারে।

'সকল আবেশ' হ'ক ধৌত। আবেশের রঙে অনেক 'আলিম্পনা' করেছি রচনা—দিনের সংগীত রচনা করেছি অনেক, এবার দিনান্ত-সংগীতের ধ্বনিমহিমা আস্বাদ করব। দাও নবজন্ম তবে। যা পেয়েছিলাম তাতে আর মন ভরছে না, যা পাই নি তার সঙ্গে, সেই অপ্রাপনীয়ের সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় হ'ক। গোধূলিলগ্নে সন্ধ্যার সিন্দুর এঁকে দাও সীমন্তে, প্রদোষ তারার আলো টিপটি এঁকে দাও ললাটে। নবপরিণীতা বধূর মত—এক সংসার থেকে অন্য সংসারে চলি নবজীবনের স্পন্দনে। জীবন-সিন্ধুর তরঙ্গতালে সেই স্পন্দন ধ্বনিত হ'ক দিনান্তসংগীতের মূর্চ্ছনায়।

সাবিত্রী-প্রার্থনায় সন্ধ্যার সুর, না কি মিলনের সুর, পরমের সঙ্গে শুভ পরিণয়ের আনন্দ বাজে যে-সুরে ? লক্ষণীয় বিষয় এই—কবিতাটির নাম সাবিত্রী, বলেছি—সূর্যমণ্ডলে যার অধিষ্ঠান। নামটি থেকে জীবনসন্ধ্যা সম্বন্ধে কবির মনোভাব তবে স্পষ্ট হ'ল। বোঝা গেল : সন্ধ্যা তবে প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা, নিত্য নব সন্ধানের সান্ত্বনা।

সাবিত্রী কবিতায়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—তিনটি স্তর : প্রভাত মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। জীবনপ্রভাত, জীবনমধ্যাহ্ন ও জীবনসন্ধ্যা—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সম্মেলিত মহাভাব-ই সত্যজীবন, অখণ্ডজীবন। তিনটির একটিকে বাদ দিয়ে জীবন সত্য নয়, সেই হেতু পূর্ণ নয়, অতএব সার্থক-ও নয়। বেদবিহিত ত্রিসন্ধ্যার তত্ত্বতাৎপর্যে এই ত্রিবিধ তত্ত্বের অখণ্ডব্যঞ্জনা, গায়ত্রীব্যঞ্জনা।

বেদশাস্ত্রে গায়ত্রীকে ত্রিমূর্তিতে যে ধ্যান করা হয়েছে হিন্দুমাত্রেই তা জানেন। সূর্যমণ্ডলসংস্থিতা বেদবতী গায়ত্রী প্রভাতে ব্রহ্মরূপা, তিনি কুমারী। নিখিলবিশ্বসৃষ্টির তিনি আদিভূতা সনাতনী। নবজাতকবর্গের তিনি-ই যেন ইষ্টদেবী। আবার মধ্যাহ্নে তিনিই হন বিষ্ণুরূপা, স্থিতিধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি, জগৎ যে যেতে যেতে-ও আছে, নানাবৈচিত্র্যের লীলায় লীলায়িত হয়ে-ও আছে—এই বোধচেতনার বিষ্ণুশক্তি তিনি, তিনি যুবতী। সন্ধ্যায় তিনি-ই হন শিবরূপা, মৃত্যুবোধনের তিনি মহাদেবী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় মহালোকে মহাযাত্রার পথে শিবশক্তি তিনি সন্ধ্যাময়ী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এক অদ্বিতীয় মহামূর্তি তিনি গায়ত্রী, তিনি সূর্যময়ী সাধ্বী সাবিত্রী।

সুখ দুঃখ ব্যথাবেদনার কিংবা আশানৈরাশ্যের 'ঘন অশ্রুবাষ্পে' মোহোন্মত্ত হয় মন, জীবনের অখণ্ড সত্য হয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সাবিত্রীপ্রার্থনা তাই : মোহাবেগের অন্ধকার দূর করো হে সূর্য—

> হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
> দেখা দিক ফুটি, ।
> বহ্নি-বীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধনী বাণী
> সে-পদ্মের কেন্দ্র মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
> মোর জন্মকালে
> প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
> আমার কপালে ॥

জন্ম হ'ল। শৈশব থেকে যৌবনপথে গতির সাধনা চলল তারপর। বলা হ'ল : তুমি যেমন প্রকৃতির ভূমিকায় নব নব চিত্র আঁকো, আর মোছো, আমি-ও তেমনি 'হাসিকান্নাভাবনাবেদনা' দিয়ে শিল্পরসের আনন্দ যেন যাই এঁকে। অর্থাৎ শিল্পরসের প্রকাশের প্রয়োজনে, বিচিত্রের প্রয়োজনে, নিয়োজিত হ'ক সুখদুঃখ-হাসিকান্না, কিন্তু মন যেন থাকে নির্লিপ্ত :

তোমার দূতীরা আঁকে ভুবনঅঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকান্নাভাবনাবেদনা
না বাঁধুক মোরে॥

বাঁধলেই কিন্তু সর্বনাশ : গতি হবে স্তব্ধ। প্রার্থনা তাই, যৌবনশক্তি, বিষ্ণুশক্তি অগ্রসর হ'ক সূর্যমণ্ডলের কেন্দ্রাভিসারে। পশ্চাতে পড়ে থাক্ যৌবনের লীলাবিলাসের খেলা ও খেলনাগুলি। শিবরূপা মৃত্যুময়ীর আনন্দে প্রচ্ছন্ন আছে যে অগমতত্ত্ব, এবার তা' যেন জানি। দাও, খুলে দাও দ্বার, প্রবেশ করি তিমিরের অন্তরে মহাসূর্যের মর্মমন্দিরে। নাও, প্রস্তুত করে নাও আমার আত্মাকে, বধূবেশে তাকে সজ্জিত করে নাও বাসকসজ্জিকার মহারূপে :

সীমন্তে গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

সাবিত্রীপ্রার্থনার ধ্বনিমাধুর্য হৃদয়ঙ্গম হ'লে পূরবীগতির তত্ত্বতাৎপর্য সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। তখন বোঝা যায়—বলাকা যেমন যৌবনগতি, বিষ্ণুগতি, সৃষ্টিবেদনার লীলাচাপল্যে নবযৌবন-রচনায় দেবযানগতি, পূরবী তেমনি সন্ধ্যাগতি, শিবগতি, যা কিছু সৃষ্টি করেছি—তারো বড়, তারো চেয়ে মহত্তর কোনো রূপজ্যোতির আকর্ষণে অতীন্দ্রিয়গতি, বাকপথাতীত অগম

'অন্ধকার সূর্যরাজ্যে 'স্বপ্নাবেশে একাকিনী' সাবিত্রীগতি।...*দিনজীবনের দেবযানগতি হচ্ছে বলাকা, দিনান্তজীবনের উত্তরপথগতি হচ্ছে পূরবী।*

এই উত্তরপথগতির আনন্দই 'আহ্বান'-কবিতার প্রাণবস্তু।

লীলাসঙ্গিনী, সাবিত্রী ও আহ্বান—এই তিনটি কবিতার ধ্বনি প্রায় একই; শুধু পরিবেশ ও চিত্রকল্পের ভিন্নতায় এ তিনটি কবিতাকে স্বতন্ত্র বলে' ধারণা হয় মাত্র। 'লীলাসঙ্গিনী'তে লীলাময়ী কবিকে বারংবার দর্শন দিয়েছেন, কবির বৃদ্ধবয়সেও এসেছেন ডাক দিতে, নিতে এসেছেন রাত্রিমৌনের সূর্যোদয়ের' সৌন্দর্যে।...'সাবিত্রী'তে বলা হ'ল—জন্মক্ষণেই তিনি, এই লীলাময়ীই, কবিকে জাগরিত করেছেন চুম্বন দানে, তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছেন দিনজীবনের কর্মান্তে দিনান্তজীবনের স্তব্ধতায়।...'আহ্বান' কবিতায় এই লীলাচঞ্চলা 'জ্যোতির্ময়ী'র কথাই উত্থাপিত হ'ল। তিনি থেকে থেকে মাঝে মাঝে কবিকে ডাক দিয়েছেন, কবিকে আকর্ষণ করেছেন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, ধ্যান থেকে ধ্যানে'র গভীরে। কবি তাঁর ডাক শোনার জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল, কেননা তিনি জানেন, তাঁর ডাক শোনার অর্থই হচ্ছে আত্মোপলব্ধির আনন্দ।

জীবনে অনেক সময় অনেকের ডাক-ই আমরা শুনি। লোভের ডাক, ক্ষোভের ডাক, বিদ্বেষের ডাক, ঈর্ষার ডাক আমরা শুনি। দৈনন্দিন আটপৌরে মনস্তত্ত্বের জীবনে এই ডাক একান্তভাবেই বাস্তব, এ-ডাক সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই জাগে না, প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জীবনে তো বৃহতের ডাকও আছে!... শহীদ যারা স্বদেশসাধক, কোন্ ডাক, কার ডাক তারা শোনে? যথার্থ যারা সন্ন্যাসী বৈরাগী, সংসারের ধনমান বা যশঃপ্রতিষ্ঠা তারা ত্যাগ করে কোন্ ডাকের সংগীতে? রাজপুত্র যে সংসারে বিরাগী—সে তো এই বৃহতের ডাক শুনেই। ওই ডাক শুনেই তো যুগে যুগে মানী ত্যাগ করে মান, ধনী ধন, বীর অমূল্য আত্মপ্রাণ। অনন্তলোকাগত মহাজীবনের যেই অশ্রুত ডাক সকলে অবশ্য শুনতে পায় না, কিন্তু যারা শোনে, শুনে পাগল হয়, সংসারে তাদের সংখ্যা অল্প ও নগণ্য হলেও পৃথিবীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা পায় তাদেরই কল্যাণে।

তত্ত্বকথা এই : এ-ডাক অহরহ আসছে, শুধু অপ্রস্তুত আমাদের বধির মন তা শুনতে পায় না। কবি বলছেন—আমি তাঁর ডাক শোনার জন্যে ব্যাকুল। আমাকে যিনি ডাক দেবেন, আমিও ডাকছি তাঁকে। তাঁর জন্যে আমি প্রস্তুত।...

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিযা।
দীপখানি তুলে ধরে', মুখে চেয়ে ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওযা, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

তাকে ডাকি, বলি, অসম্পূর্ণ আমি, পূর্ণ করো আমাকে। তা সে যে আমার ডাক শোনে না, তা নয়। মাঝে মাঝে থেকে থেকে সে দ্বার খোলে, মাঝে মাঝে তার দেখা পাই—চিরদিন পাই না বলে' দুঃখও পাই। মাঝে মাঝে সে যখন আসে, দীপখানি তুলে ধরে' আমার মুখ দেখে। মনে হয়, তার মুখ দেখে মনে হয়, যেন সে আমাকে চিনেছে। বুঝেছে, আমি তার জন্যে, প্রেমের জন্যে, কি না পূর্ণের জন্যে, প্রস্তুত। তাই তাব মুখে বুঝি ভরসার আলো ফোটে। সেই আলো দেখে বুঝতে পারি—আমার মধ্যে তাহ'লে এমন কিছু আছে যা দেখে তার মুখে চোখে প্রকাশ পায় আলো। নিজের ওপর তখন খুবই বিশ্বাস হয়। আত্মোপলব্ধি ঘটে। নিজেকে চিনে নিই তারই দৃষ্টির আলোকে।

কিন্তু জীবনে এমনটা তো সবসময় ঘটে না। দৈনন্দিন তুচ্ছতায় মগ্ন হয়ে আত্মোপলব্ধির আলো ফেলি হারিয়ে। জনতার মধ্যে একজন হয়ে, নগণ্য হয়ে, আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে থাকি লুপ্ত। এমন সময় কোথা থেকে সে এসে আমাকে ডাক দেয়। আমি যে তুচ্ছ নই, মানবজাতিটা তুচ্ছতায় নগ্ন হয়ে টিঁকে থাকার জন্যে যে জন্মায় নি—এটা বুঝি। সহস্রের মাঝখানে সে আমাকে

তখন আবিষ্কার করে—আবার তাই আত্মসম্বিত হয় উদ্বুদ্ধ ঃ নবজন্ম সম্ভব হয় তখন। অবলুপ্তির মৃত্যু থেকে প্রস্তুতির সূর্যজন্মে উঠি জেগে। বুঝতে পারি, আমিও তবে আছি। ঊষা যেমন পৃথিবীর সুপ্তির দুয়ারে এসে ডাক দেয়ামাত্র প্রভাত ওঠে জেগে, বীণা হাতে বেরিয়ে আসে দ্রুত, গানে গানে ভরে আকাশ, আমিও তেমনি তার ডাক শুনে আপন অস্তিত্বে প্রত্যয় আনি, নৃত্যকলরোলে মাতাই পৃথিবী।

মানুষের অন্তর্জীবনে এমনতর ডাক অহরহই ধ্বনিত হচ্ছে। যতবার ডাক, ততবারই নবজন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে অসকলোকে মহীয়সী কোন্ জ্যোতির্ময়ী অহরহ ডাকে পৃথিবীকে—তাই তো পৃথিবীতে এত রূপ, এত গান, এত বর্ণ, এত গন্ধ, এত আলো। মানবপ্রকৃতির অন্তরালেও সেই জ্যোতির্ময়ী ডাক দিচ্ছেন অন্তরাত্মাকে, সেই ডাকেই মর্ত্যগৃহে নামে প্রেম, নামে প্রেয়সী, ভঙ্গুর মাটির জীবনেই আনে অমৃতের আস্বাদ। অদৃশ্য জ্যোতি থেকে যেমন সূর্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র, মর্ত্যলোকে অদৃশ্য সেই জ্যোতির প্রেম থেকে-ই প্রেয়সী নারী,—নারী আর কে, সে তো সেই জ্যোতির্ময়ী মহাদেবীর আহ্বান আলোক।

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী
দেবতার দূতী।
মর্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দুবাহু বাড়ালে।

রবীন্দ্রকল্পনায় নারীর মর্যাদা দেবীর মর্যাদা। নারী হচ্ছে দেবী জ্যোতির্ময়ীর-ই অংশ, এইজন্যে নারীতে দেখি প্রেমের প্রকাশ, কি না শক্তির প্রকাশ। নারীর প্রেমে, সত্যকার প্রেমে, পুরুষ বদ্ধ হয় না, বরং মুক্তি পায় নব নব প্রেরণার আনন্দে, অভিনব চেতনার রোমাঞ্চে।

প্রেম জিনিসটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা' নয়। সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি নারীর আদর্শে। *

নারীর প্রেমে যে জীবনবেগ ও চেতনা, সেই চেতনার পুলকাবেশে অলক-লোকের ডাক শুনি। 'বেদনার বেগে', অর্থাৎ জাগরণের অমিত উচ্ছ্বাসে 'মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীতশতদল' নৃত্য করে' তখন জেগে ওঠে।

শুধু কি এই ভাবপ্রেরণার আনন্দটুকুই? না। শক্তি-ও জাগে নারীর প্রেমচেতনায়ঃ

সুপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে
বীরের দক্ষিণহস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ
অসত্যেরে হানে।

পুরুষজীবনে নারীর যে এত মূল্য, এত মহিমা, তার কারণ নারীতে সেই মহানারীর আভাস। সেই মহীয়সীই তো রূপের ঔজ্জ্বল্যে, প্রেমের মহিমায়, তাপসের সাধনায়, বীরের মুক্তিমন্ত্রে, নারীর সেবাকর্মে অহরহ আসছেন। তাঁরই প্রতীক্ষায় তো আছিঃ

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।

'একা বসে জাগি'—আর কেউ না, বস্তুতান্ত্রিক বিজিগীষায় উন্মত্ত সবাই পার্থিব সুখসঞ্চয়ে। দিনজীবনের সম্পদ সঞ্চয় করতে গিয়ে দিনজীবনের গ্লানি-ই সঞ্চয় করে তারা। প্রেম থেকে, প্রেয়সী থেকে, প্রকৃতি থেকে অগম লোকের

* রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, যাত্রী, পৃঃ ৩৮৩।৮৪

অভিসারিকার আভাস কি তারা পায়? যদি পেত, আমার মত একাকিত্বের সাধনায় যেত বসে। মৃত্যুরসের পুলকোচ্ছ্বাসে আস্বাদ করত নবজীবনের অমৃত। প্রতীক্ষা করত—সে আসবে, তিমিরের তীরে দেবে দর্শন,—যে-গান এখনো গাই নি, গাইতে পারি নি, সেই বাকপথাতীত অগমলোকরহস্যের বাণী দেবে উপহার।

'একা বসে জাগি' তার 'চরম আহ্বানের' প্রতীক্ষায়। 'এ-জীবনে' 'মোর শেষ গান' 'পূর্ণ তানে' এখনো 'সাঙ্গ' হয় নি—শুধুমাত্র প্রকাশলোকের গান-ই গেয়েছি অপ্রকাশ আনন্দলোকের চৈতন্যসংগীতি কবে পাব?

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে।
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছে রমণী,
নীরব নিশীথে।

অরূপ অনন্তলোকে মৌনের রহস্যে তুমি সমাসীনা, তোমার চরম আহ্বানের পূর্ণ তত্ত্ব রসের শিল্পে রূপ দিতে চাই—দেয়াব সাধনায় প্রস্তুত করে' নাও আমাকে। চোখে এখনো যে মোহের অঞ্জন আছে, আছে কালো, বজ্রবেগে তাকে আগুন করে নাও। এসো কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবে, বর্ষণ-কাঙাল মেঘের অন্তরে জ্বালো বিদ্যুৎবহ্নি,--শোকে, তাপে ও দুঃখের অশ্রুভাবে থমথমে যদি মেঘাকাশ, দানের বন্যাবেগে তাকে মুক্ত করে' দাও। সব নিয়ে—সুখ নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, মান নিয়ে, অপমান নিয়ে, সব নিয়ে রিক্ত করো আমাকে।

বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি কর পরিত্রাণ
সব লও লুটে।

রিক্ততা-ই পরম ঐশ্বর্য, অশেষের আনন্দ। বস্তুবিশেষের অহংকারে অশেষের আনন্দ আমরা হারাই। ধীর স্থির স্তব্ধতার মধ্যেই যে পথিকজীবনের শান্তি—সেটা তখন ভুলে যাই। আজ শান্তি নেই, পূর্ণত্বের প্রশান্তি নেই—কেননা দিনজীবনের বহু বিশেষে মন আছে মত্ত। এখানকার আনন্দ, বলাই বাহুল্য, বিশেষে প্রভাবিত সীমিত আনন্দ। ঐশ্বর্য পেয়ে যে আনন্দ, তা ঐশ্বর্য-প্রভাবিত

সীমিত আনন্দ ; যশ পেয়ে যে আনন্দ, তা যশপ্রভাবিত সীমিত আনন্দ। এ সব আনন্দ দিনজীবনের দীন আনন্দ ছাড়া আর কী ?

সন্ধ্যাজীবনে জ্যোতির্ময়ীর চরম আহ্বানের সর্বরিক্ততায় যে-আনন্দ, স্বচ্ছ আনন্দ তারি নাম।

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্ব শেষ ক্ষতি
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব
অশ্রুধৌত জ্যোতি।

'অরূপসুন্দর জ্যোতির' আনন্দে পূরবী-কবির অভিসার। লোক থেকে লোকান্তের রসাস্বাদে তাঁর বাসনা। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের সন্ধানে তিনি ধ্যানস্তব্ধ। 'দিনান্তের যাত্রাসহচরীর' সাক্ষাৎ মিললেই পথ আর অগম রইবে না। কিন্তু কোথা সেই যাত্রাসহচরী? মৃত্যুমহিমার আনন্দবোধ চেতনায় সঞ্চার করে' দিয়ে প্রচ্ছন্ন সে অগমের সিন্ধুপারে। তাকে আজ, এই দিনান্ত হওয়ার আগেই, কোথায় পাব ? কোথায় খুঁজব ? দক্ষিণ পবনে ? অরণ্যের পল্লবমর্মরে ? বসন্তসৌগন্ধ্যে ? এ-সব তো দিনের ঐশ্বর্য—দিনান্তে এ-সব তো অপ্রাসঙ্গিক। দিনান্তজীবনের পূর্ণতা আহরণের পথে দিনলোকের ঐশ্বর্যের মূল্য কী ? মর্যাদা কী ?

তিমির রাত্রির বাণী গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের-আচেনা

সেই রহস্যবাণী কি দক্ষিণপবনের আছে জানা ? বসন্তগন্ধ কি জানে তার পূর্ণমন্ত্র ? তারা তো রহস্যলোকের আভাসটুকু, ইঙ্গিতটুকু মাত্র-ই দিতে পারে, পূর্ণত্বের প্রশান্তি কি পারে দিতে ?

দিনান্তজীবনের রসবোধে এ-সব 'বহুক্ষণ গেছে চলি'। অন্যভাষায়—বহুক্ষণ ও-সবের বন্ধন থেকে এসেছি চলে। এখন নিভৃত মন্দিরে 'সন্ধ্যারতিলগ্নে'

'শেষপূজারিণীর' প্রতীক্ষায় আছি বসে। আরতি অন্তে তার দেখা পাব, এখনো আরতি হয় নি শেষ, দিনান্তসংগীতের পূর্ণ রহস্য হয় নি উদ্‌ঘাটিত।

প্রকাশজীবনের 'ট্র্যাজিডি-ই তো এই ঃ এখানে কিছুই নয় পূর্ণ, কিছুই নয় সমাপ্তির ঔজ্জ্বল্যে সূর্যস্নাত। তাৎপর্য এই ঃ অপ্রকাশজীবনে জন্ম না নিলে পূর্ণত্বের আস্বাদ সম্ভব-ই নয়। পূর্ণজীবন অবশ্য পূর্ণ-ই, কিন্তু দিনজীবনের সীমিত বোধটুকু দিয়ে তা' বোঝা সম্ভব নয়। জীবন তো দিনটুকু মাত্র নয়, রাত্রি নিয়ে-ও বটে ; সীমিত কর্মটুকু মাত্র নিয়ে নয়, ধ্যানের দিগন্তব্যাপ্ত অপাবৃত মৌন নিয়েও বটে। দিন ও রাত্রির অখণ্ড সত্যসত্তায় মহাজীবনের যে উপলব্ধি, সেই সে রসোপলব্ধির অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী 'লীলাসঙ্গিনীর' মত 'গোপনরঙ্গিনী'— তিমিরে তার 'পরশলহরী' দোলে। সূর্যব্রহ্মার অন্তর্বিলাসিনী মহাদেবী 'সাবিত্রীর' মত শুধু প্রভাতে নয়, মধ্যাহ্নে নয়, সন্ধ্যালোকের গোধূলিলগ্নেও তার পরম আবির্ভাব। তাই প্রশ্ন এই ঃ এপারে যা' পূর্ণ নয়, পূর্ণ হওয়ার নয়, ওপারে তা-ই কি পূর্ণত্বের বরণডালিতে হয় না সজ্জিত ?

পূর্ণত্বের এই ধ্যানই, বলা বাহুল্য, মনোজীবনের মুক্তি। দিনজীবনেই যদি দিনান্তজীবনের মহিমারস আস্বাদ করে থাকি—তবে দিনজীবনের এটা-সেটা তুচ্ছতায় আর মন দেই না, লোভ থেকে দূরে থাকি, ক্ষোভ যাতে না করতে হয় তার সাধনা করি, মোহের মত্ততা থেকে প্রেমধর্মের আনন্দে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস পাই। অর্থাৎ সত্য যা' অনুভবে জেনেছি বাস্তব জীবনের ব্যবহারের পথে তা' কাজে লাগাই। এতে কী হয় ? না, মনের সূর্যদর্শন সম্ভব হয়। বিজ্ঞানানন্দের অভিমুখে পথিক হয় মন। দিনান্তজীবনের রহস্যসৌন্দর্য মর্মলোকে তখন অহরহ রশ্মিপাত করে। ফলে জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমহিমার গৌরব আস্বাদে প্রেমজীবনের মুক্তি করি অনুভব। বোধশক্তি তখন তীক্ষ্ম হয়, দৃষ্টিশক্তি হয় দিগন্ত-প্রসারী। তখন কী আর হয়, ঋষিদৃষ্টি হয়। মুক্তির আর হাতিঘোড়া কী আছে, এই মুক্তি।

'যত মত তত পথ'। মুক্তির পথ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। * কেউ বলেন জগৎব্রহ্মাণ্ড মায়া, জৈববাসনাদি মায়ার বন্ধন। কেউ বলেন, জগৎ সত্য, বাসনাদিও মিথ্যা নয়। জগৎকে অনিত্য বলে' আচার্য শংকরের মত বাসনামুক্ত সন্ন্যাসীরা মুক্তিপথে অগ্রসর হন। আর আচার্য রবীন্দ্রের মত কবিরা জগৎকে সত্য বলে' স্বীকাব করে' বাসনার মধ্য দিয়েই জগদতীত অগমতত্ত্বের সন্ধানে অভিসার কবেন। সন্ন্যাসী ও কবির মুক্তি একজিনিস নয়, তত্ত্ব-ও নয় এক। ...কে ঠিক, কে বেঠিক, এ-প্রশ্ন এখানে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। মত ও পথ মানুষ বেছে নেয় আপন আপন অধিকার ভেদে। যোগে যদি আনন্দ, তবে শংকর। কাব্যে যদি রসাস্বাদ, তবে রবীন্দ্রনাথ। চিত্তবৃত্তির ত্যাগ ও নিরশন-ই যোগের আদর্শ; চিত্তবৃত্তির বৃহতে রতি ও স্ফুর্তি-ই হচ্ছে কবি-ভাবেব গন্তব্য। ...মনকে নিশ্চিহ্ন 'করে' নির্বেগ কবে' বিজ্ঞানানন্দে স্থিতি হচ্ছে সন্ন্যাসমুক্তি। মনকে নির্মল কবে' অথচ বেগবান বেখে' মানসানন্দে নিত্যগতি হচ্ছে কবিমুক্তি।

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।

—মুক্তি।

'নানা স্বাদে' 'নানা স্রোতে' বহা-র অর্থ হচ্ছে অধিকার-ভেদ। যার যেমন অধিকার, সুধাব স্বাদ-গ্রহণশক্তি তার তেমনতর। অধিকার একরকমের হবে একছাঁচে ঢালা হবে, জগৎ-প্রকৃতির এটা কথা নয়।

বিজ্ঞানানন্দে যোগমুক্তি রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর মুক্তি মানসানন্দে প্রেমমুক্তি, বৈরাগ্যমুক্তি। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী সত্যকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করে, তার সঙ্গে আত্মার যোগসামঞ্জস্য স্থাপন করে আনন্দভরে জগৎকল্যাণের কর্ম করা-ই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, তাঁর কর্মাদর্শ।

* কর্তার ইচ্ছায় কর্ম দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৩

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।
সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ-বীণার স্পন্দন;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা—
বিশ্বগীতপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।
—মুক্তি।

'অশান্ত ভাবনা'—বলা বাহুল্য, ততদিন-ই, যতদিন মানুষ বিশ্বসত্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে না জানে। মৃত্যুর সত্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সৌন্দর্য মিলিয়ে নিতে পারি না, জীবনে তাই, মৃত্যুরস আস্বাদ্য যে, তা মনেই হয় না। পরন্তু ভয়েই মরি। ভয়টা কে না জানে, বিশেষ মোহ থেকে আসে! বিশেষ মোহ বা আসক্তিতে আমরা অন্ধভাবে সীমিত জগৎ রচনা করি—সে-জগৎ যতকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, উপভোগ্য থাকে, ততকাল-ই আমাদের আনন্দ, মৃত্যু এসে সে-জগতের যখন পরিবর্তন ঘটায়, (এবং তা' ঘটাবে-ই) তখন অশান্ত ভাবনায় চিত্তকে করি ভারাক্রান্ত। খণ্ডাশ্রয়ী জীবনে এ ভার, এ বোঝা থাকেই। অখণ্ড জীবনকে যে জানে, মানে,—খণ্ডের রূপপ্রেরণায় সে আনন্দ পায়, শিল্পের আনন্দ, এ-কথা সত্য, কিন্তু বদ্ধ হয় না, কারণ সে জানে, খণ্ডের শেষ আছে, তা' থাকার নয়, যাওয়ার।

যাওয়ার জন্যেই আসা। খণ্ডজীবনটুকু নিয়ে অচল আমরা হতে পারি নে। অখণ্ডসত্যে অবিচলিত থেকে নিত্য সচল থাকা-ই শোভন, সঙ্গত। এই সঙ্গত জীবনের প্রেমই মৃত্যুকে মধুর বলে' জানে, বৈরাগ্যকে আত্মা বলে' মানে।

প্রেমের আনন্দে এই কল্পনা : দিনান্তজীবনে আমার জন্যে বরণডালা তিনি

সাজিয়ে তুলছেন। বৈরাগ্যের আনন্দে এই প্রতিজ্ঞা ঃ দিনজীবনের কোনোবিত্ত-ই নেব না সঙ্গে। খণ্ডজীবনের কোনোকিছুতেই হব না বন্দী। অবিচলিত আমি চলমান পথিক, দান দিতে দিতে অভিসার করব তার পথে, অকিঞ্চন বেশে যাব চলে, রিক্ততার মহৈশ্বর্যে প্রবেশপথ পাব তাঁর মন্দিরে।

কবিগুরুর এই পথিকতত্ত্ব। এ-তত্ত্বের শিল্পরূপ পূরবী-কাব্য, মৃত্যুবোধের মহানন্দে দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে যার প্রেম, উত্তরের শান্তিআবাহনে যার বৈরাগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

মানব : সমাজচেতনা

প্রেমবোধের প্রেরণা থেকে যে-সমাজসেবায় চেতনা—কোনো কোনো মহলে তা' কর্মবিহীন ভাববাদ বলে' উপেক্ষিত হতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের বিচারে জীবনব্যাপারে তা' অপরিহার্য, কেননা তার দ্বারা-ই মানুষকে সামাজিক করা সম্ভব, মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণ-করা সম্ভব। রবীন্দ্রকল্পনায় প্রেম একটি ভাব মাত্র নয়, তা' শক্তি, সংকল্প, তা সর্ববিধ কর্মব্যাপারের উৎসভূমি—এই কারণে তা' সর্ববিধ বস্তুকর্মেরো প্রাণস্পন্দন। প্রেম শুধু তো ব্রহ্মপ্রেম কি বিশ্বপ্রেম নয়, তা দেশপ্রেম, সমাজপ্রেম, এমন কি অহং-প্রেম-ও তো বটে। অহং থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত যে-প্রেম প্রসারিত, সে-প্রেম কাউকে বা কিছুকে এড়িয়ে যায় না, পেরিয়ে-যাওয়া-ই তার স্বভাব। রবীন্দ্রশাস্ত্রে, একাধিক বার বলেছি, এই পেরিয়ে-যাওয়ার স্বভাবটির নাম-ই হচ্চে বৈরাগ্য কি না বৃহতে রতি। প্রেমের মধ্যে এই মহতী রতির ধ্যানটি থাকার ফলে—প্রেম থেকে যে-সমাজচিন্তা বা কর্মচিন্তা তার মধ্যে সমষ্টিগত মঙ্গলকামনার অর্থাৎ বৃহত্তর মানবসমাজের মঙ্গলকামনার চেতনা-ই থাকতে পারে, ব্যক্তিস্বার্থের, গোষ্ঠিস্বার্থের বা পার্টিস্বার্থের কোনো মর্যাদা তার মধ্যে ঠাঁই পেতেই পারেনা—এইজন্যে প্রেমপ্রজাত সমাজচেতনায় রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক কোনো বাদ বা বাদানুবাদের প্রশ্রয় নেই যে, তা' একপ্রকার বলা-ই বাহুল্য।

যুগের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যে-সমাজচেতনার আন্দোলন, তার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, বিশিষ্ট বিধিবাদ আছে। এ-আন্দোলনের যাঁরা কর্তা বা অনুসারক, তাঁরা চেতনার চেয়ে বিধি ও পদ্ধতিটার ওপরই বেশি জোর দেন। বিধি যাঁরা মানেন, বিধি অনুসারে কর্ম করতে গিয়ে মানব ধর্মবিরোধী কোন ব্যাপার-ও যদি ঘটিয়ে বসেন, তবু তাঁরা সমাজসচেতন

গোষ্ঠির মধ্যে বাহবা পেতে পারেন; কিন্তু বিধি যাঁরা জানেন না, এমন কি জেনে-ও যাঁরা মানেন-ও না, তাঁদের মঙ্গল-চেতনা বা সমাজকর্ম সমাজীদের সমর্থন তো পায়-ই না, উপরন্তু তা' বুর্জোয়াদের কৌশল-কলা বলে' নিন্দিত হয় মাঠে-মিছিলে।

রবীন্দ্রনাথকে এই সেদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের কবি বলে' এক-ঘরে করার হাস্যকর চেষ্টা চলেছিল; সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের বাঁধাধরা ফরমুলানুসারে তিনি কাব্য করেননি বলে' সমাজীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের সীমা ছিল না। সমাজতান্ত্রিক সেই সজ্জাবিহীন বন্ধনমোহের উগ্রতা বর্তমানে একটু হ্রাস পেয়েছে, এখন ধীরভাবে রবীন্দ্রকল্পিত মানববোধের ধ্বনিটি আস্বাদ করা তথা উপলব্ধি করা হয়তো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের মানববোধ বা সমাজবোধ প্রেমচেতনা থেকেই উদ্ভূত। প্রেম যদি সত্য, তবে মানব স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন, ভক্তিভাজন। স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি দেব যাকে, তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনাই করব, তাকে প্রতারণা করার বাসনা আনব না স্বপ্নে-ও। তখন ভাবটা এই ঃ মানুষের কি সমাজের চিন্তা বা কর্ম করি, না করে' পারি না বলে'। মানব-মঙ্গলে আমার আনন্দ, সমাজ-কল্যাণে আমার অন্তরাত্মার বিকাশ।

> নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা, প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায় কল্পনার খেলায়, নানান টানে, মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া, সে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে-মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনিই যথার্থ মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে-ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে না পারিয়াছে তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোট করিয়া আনে।
>
> সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা, আমাদের মানবাত্মার এই যে একটা স্বাভাবিক

ধর্ম—স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহংকার তাহার একটা বাধা ; সংসারে এইসকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না। *

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে মানুষ তার আত্মার স্বাভাবিক ধর্মটি নষ্ট করে বসেছে ; সৌন্দর্য প্রকাশ দূরের কথা, কুৎসিত পশু-আচরণে মানুষ মানুষের অমিত্র হয়ে বসেছে ঘরে-বাহিরে। ধর্মচেতনা অর্থাৎ প্রেমচেতনা যতদিন না মানবসমাজে সমর্থিত হবে, ততদিন মানুষ মানুষের অমিত্র হতে লজ্জা পাবে না বলেই জানি। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ততদিন নিষ্প্রেম আমরা মানুষকে ঠকাব, শোষণ করব, শুকনো হাড় থেকে রক্ত শুষে শক্তি সঞ্চয় করব, যুদ্ধের ভয় দেখাব, নানাপ্রকার মারণাস্ত্র করব নির্মাণ, ঘরে যা' চাইতে পারি না মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধে, পরের ঘরে তা-ই-ই চাইতে যাব অমানুষিক দানবীয়তার শক্তিদম্ভে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে-ও কাজ চলবে : মানুষের বিরুদ্ধে লাগাব মানুষকে, মানুষ-হৃদয়ের সুকুমার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি সুকৌশলে নিষ্পেষিত করব। অন্তরে তার সঞ্চার করে' দেব নিত্য অসন্তোষ ও বিদ্রোহবহ্নির বিক্রুষ্ট যন্ত্রণা। ধর্ম বা প্রেমের প্রভাবে পাছে তাদের হৃদয় শান্ত হয়, কান্ত চেতনার সৌজন্যে পাছে তারা লজ্জা পায় অশোভন কোনো অমানুষিক আচরণে—এইজন্য ধর্মকে, কি না প্রেমকে, পরিহার করব শক্তি-তত্ত্বের উদ্ধত সমর্থনে।

প্রশ্ন তুলেছিলুম—আমার সত্তার মূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিমন্ত্রের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে!

শক্তিকেই যদি সেই সত্য বলে বরণ করি তাহলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন বলে মানতেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শান্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ,—বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না ; শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়—অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম বলে' নিন্দা করে, সেই অধর্ম-ই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

* সাহিত্য : বিশ্বসাহিত্য, পৃঃ ৫৮

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না ; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে :

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি

ততঃ সপত্মান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

ঐশ্বর্য গর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানে-ও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না— যে ক্রুর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বাম হস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপস্বরামত্ত যুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবল-ই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায় ; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয় ; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই।' *

য়ুয়োরোপীয় এই শক্তিবাদী পৃথিবী আজ মোটামুটি যে-দুটো সমাজে বিভক্ত হয়ে গেছে, ইতিহাসে তাদের নাম—ধনিকসমাজ আর শ্রমিকসমাজ। দুই সমাজের হাতেই শক্তির মারণাস্ত্র। প্রেমবাদী মানুষ শান্তির মন্ত্র নিয়ে তৃতীয় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় আজ তৎপর। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমবাদী মানবসমাজের নেতৃস্থানীয় কবিপুরুষ। ধনিক নয়, শ্রমিক নয়, মানবমঙ্গলে তাঁর সাধনা। ধনিকসমাজকে তিনি সমর্থন করবেন না—তার শোষণপন্থার অমানবিক পদ্ধতির জন্য। ‡ আবার শ্রমিক সমাজকে-ও তিনি ভর্ৎসনা না করে পারবেন না, যদি তারা অমানবিক পন্থানুসরণে রাজনৈতিক প্রভুত্বলিপ্সুদের হাতের পুতুল মাত্র হয়ে পড়ে। আসলে প্রেমবাদী এই মহানকবি নিত্যকালের নিরপেক্ষ সমাজসাধক, মর্মতঃ অনাসক্ত থেকে কর্মতঃ মানব-কল্যাণে তাঁর সংগ্রাম, তাঁর স্বপ্নসংকল্প। কোনো বাদবিবাদের বন্ধনে তিনি আদৌ বন্দী নন বলে' নিত্য চলমান জীবনের তিনি দিব্যপথিক, তিনি ডায়নামিক, তাঁর সমাজবোধ বৈরাগ্য-দীপ্ত প্রেমচিন্তার ন্যায়ধর্ম থেকে সমায়াত, এইজন্য স্বজাতিকে ভর্ৎসনা করতে তাঁর বাধে না, প্রবলজাতিকে নিন্দা করতে, তার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে,

* রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, কালান্তর, পৃঃ ২৯৭।৯৮,

‡ কালান্তর : লোকহিত দ্রষ্টব্য

তাঁর ভয় লাগে না। * প্রচলিত মত ও পথ যদি কল্যাণ-ই আনয়ন করে—তবে তা প্রাচীন বলেই যে নিন্দনার্হ হবে, তা নয়, আবার সদ্য-আগত নূতন কোনো জীবনবাদ সত্যকার মঙ্গলের যদি বার্তা শোনায় তবে তা' নূতন বলে-ই যে উপেক্ষিত হবে—তা-ও নয়। ‡ 'সাহেবি অনুকরণ' তাঁর ধাতে সয় না, যদি-ও প্রতীচ্যের যা স্মরণীয়, যা বরনীয়, তা অবশ্যই তিনি শিরোধার্য করবেন।… 'হিঁদুয়ানি' বা 'আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা'য় তাঁর লজ্জা, যদি-ও প্রাচ্যসভ্যতার যা শ্রেয়, যা সুন্দর, ভবিষ্যজীবনের পক্ষে যা সান্ত্বনাপ্রদ—ভক্তের আনন্দ নিয়েই তিনি তা' গ্রহণ করবেন, প্রচার করবেন।

এ-হেন প্রেমমানসকে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রের বাঁধাধরা ফরমুলার জালে বাঁধতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হন, দোহাই আপনার, ভুল করবেন না আর। আপনি ভুল করলে আমাদের সকলের ক্ষতি। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনি, আপনি যা করবেন; সমাজে তা-ই ক্রমশঃ সঞ্চারিত হবে। ভুলটা সঞ্চারিত করে' সমাজচেতনার নামে অসমাজিক দম্ভবিকারের প্রশ্রয় দেবেন না।

দ্বান্দ্বিক নিয়মে মানবসমাজ অহরহ অগ্রসর হচ্ছে, অগ্রসর হচ্ছে পূর্ণের অভিমুখে ; কিন্তু সমাজ চেতনায় পূর্ণ টি কী বস্তু, একবার ধীরভাবে তা ভেবে দেখা দরকার। পূর্ণ যদি হয় সমাজজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, কল্যাণ—তবে কথাটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে বলা ভালো, যে, সমাজে ইষ্ট সেই কল্যাণ এখনো সমায়াত হয়নি, তাই গতির শেষ হয়নি।…বর্তমানে যা পেয়ে আছি তা' যদি 'থিসিস্'—তাকে গতি দেয়ার আনন্দে আসবে 'অ্যান্টিথিসিস্,' কিন্তু 'অ্যান্‌টি'র নিত্যবিরোধে মানুষ চিরকাল অশান্ত থাকতে পারবে না, আসবে দুয়ের মধ্যে মীমাংসার পূর্ণতা, আসবে 'সিন্‌থিসিস্'। 'সিন্‌থিসিস্' বা সামঞ্জস্য তাহ'লে দুই বিরোধীতত্ত্বের অদ্বয় সমন্বয়, যার মধ্যে সম্ভাব্য পূর্ণসমাজের গতিশক্তি আছে প্রচ্ছন্ন। গতি হচ্ছে নিত্যশক্তি—সুতরাং এ-যুগের বিচারে যাকে 'সিন্‌থিসিস্' বলে' শান্ত হচ্ছি—অনাগত কালে সেইটেই আবার 'থিসিস্'রূপে হবে গৃহীত,

* সভ্যতার সংকট দ্রষ্টব্য।

‡ স্বদেশ : নূতন ও পুরাতন দ্রষ্টব্য।

সেই গৃহীত-ভাবের বিরোধ-ও জাগবে 'অ্যান্‌টি'র বিদ্রোহে, আর সেই কারণে সমাজমানসে প্রমুদিত হবে সিন্‌থিসিসের, সামঞ্জস্যস্থাপনের, ব্যগ্রতা। এই যে তথাকথিত স্থিতি থেকে নববিরোধে অগ্রগতি, যুগপ্রজাত বিরোধ থেকে নব-মীমাংসায় নিত্যপ্রগতি—এ তো শুধু হেগেলীয় আধ্যাত্মিক মানস-ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়, মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞান ও কর্মব্যাপারে-ও প্রযোজ্য, অর্থনৈতিক বৈষম্যনাশের বিপ্লবব্যাপারে-ও প্রযোজ্য।

ভালো কথা। কিন্তু এরো চেয়ে ভালো কথা—সংসারে কিছুই থাকে না, কিছুই স্থির নয় ঃ আজ যেটিকে সমাজসত্য বলে' গ্রহণ করে' চলতে সুরু করছি, কাল তার-ই 'অ্যান্‌টি' এসে আমাকে প্রতিহত করছে। মীমাংসার পথ তাই খুঁজতেই হচ্ছে, জানতে হচ্ছে ঃ সমাজচেতনায় দ্বান্দ্বিক গতিশক্তি মানুষকে কোনো সময়সত্যে-ই, খণ্ডসত্যে-ই, স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের বিধি ও পদ্ধতি তাই পরিবর্তিত হতে বাধ্য। দ্বান্দ্বিকনীতি যদি সত্য ও অমোঘ, তবে এই অমোঘনিয়তির টানে-ই এ-যুগের তন্ত্র-মন্ত্র বদলাবে। এটা স্বাভাবিক।

সমাজে মঙ্গল-ই আসল বস্তু, সেটাই লক্ষ্য ; মঙ্গল আনয়নের বিশেষ-বিশেষ বিধি, নীতি, উপায় বা পদ্ধতি উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য ছেড়ে উপলক্ষ্যটাকে প্রবল করি বলে' বিধি-পদ্ধতির ওপর-ই জোর দিতে যাই, বুঝতে চাই না—তার দ্বারা মঙ্গল নয়, অমঙ্গল-ই আনি অজ্ঞাতসারে।

> মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষ্যের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে ; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে ; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া উঠে ; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন পাশ করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।
>
> তেমনি নিয়ম সংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়। এটা মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ।

সমাজীরা যখন সংসারের সর্বত্র-ই তাঁদের মনোনীত নিয়মনীতির ছাঁচটুকু-ই

* সাহিত্য : সৌন্দর্যবোধ, পৃঃ ৩০

কেবল দেখতে চান, আর সেই-দেখার প্রত্যাশাকেই প্রগতিবাদ বলে ঘোষণা করেন, তখন তাঁরা জড়বাদী-ই শুধু নন, তাঁরা জড়বৎ স্থবির-ও বটেন। দ্বান্দ্বিক গতির কথা তাঁরা মুখে বলেন—কিন্তু সমাজে কোনো নিয়মনীতিই যে চিরন্তন নয়, তা বোঝেন না। বুঝলে অবশ্য কোনো গোল-ই আর থাকে না। তখন তাঁরা না মেনে পারেন না যে, সমাজের সাময়িক তন্ত্র-মন্ত্র—যা বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, কালে তা সেকেলে হয়ে যায়, নূতনের আগমণ ঘটে নবসমন্বয়ের প্রয়োজনে।

এটা কেন হয়? না, মানুষের মধ্যে মানুষটা বিশেষ কোনো নীতির দাস নয় বলে'। সে সামাজিক হতে চায় বলে' অন্তরতঃ সে আধ্যাত্মিকও বটে। কথাটা শুনেই নাসিকা কুঞ্চিত করবেন না। নাসিকা কুঞ্চন করলে আপনাকে ভালো-ই দেখায়, কিন্তু বর্তমানে রূপদর্শন আমার প্রসঙ্গ নয়, তত্ত্বদর্শন-ই আমার প্রসঙ্গ। তত্ত্ব-প্রসঙ্গটা ধীরভাবে ভেবে দেখবেন।

দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজ সাময়িকভাবে যা হয়ে পড়ে, সাধারণ মানুষ তার-ই অনুসরণ করে; কিন্তু তাই বলে' মানুষ দ্বান্দ্বিক নিয়মটার সময়গত সত্যের কাজে চিরকালের দাসখত্ লেখায়, এটা আমি কখনো স্বীকার করি নে। মানুষ সর্ববিধ নিয়মের ঊর্ধ্বে চলমান নিত্যপথিক, নূতনের সে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজটা ক্রমশঃ যা হচ্ছে—তাকে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন ও সংকল্প প্রথমে একটা মানুষের মাথায় হয়তো জাগে, পরে তা সঞ্চারিত হয় বহুজনের মধ্যে। অনেকে যে-সমাজসত্য গ্রহণ করে, সাময়িক সেই প্রতীয়মান সত্যের 'অ্যান্‌টিথিসিস্' আপনি-ই নিয়ে আসবেন ভবিষ্যতে, আপনি না আনেন, আনবেন অন্য কেউ, যিনি নিত্যসংগ্রামী এই মানুষেরি সন্তান। মানুষ আধ্যাত্মিক: কোনো প্রকার নিয়মেই সে জড়ত্ব পেয়ে পাষাণবৎ হতে চায় না। একটি জিনিস সে চায়—সে চলতে চায়। কিন্তু কেন? না, যা প্রভূত, যা একেবারে পূর্ণ, যা ভূমা, তাতে-ই তার সুখ, অল্পে তার সুখ নেই। সংসারে যা-ই কিছু পান না কেন, অন্যের কাছে তা' প্রভূত হলে-ও আপনার কাছে নিশ্চয়ই তা অল্প, তাই আপনার সুখ নেই, তাই নিত্যসাধনা, নিত্যসন্ধান।

মানুষের স্থান তাই সমাজেরো ওপরে। সে মঙ্গলের সাধক, সত্যের সাধক। সত্যের স্বরূপটি কেমন?

উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সে হচ্ছে, শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শান্তং হচ্চে সেই সামঞ্জস্য, যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত, "নিমেষা মুহূর্তাণ্যর্দ্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"।—শিবং হচ্চে মানব-সমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়ে-ও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্চে: অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়; আর অদ্বৈতং হচ্চে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।

'যাঁদের মন খৃষ্টিয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষদ্ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃষ্টিয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" এই মন্ত্রটিকে চিন্তা করে দেখলেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্চে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্র স্বরূপে সত্যং শিবং সুন্দরং বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত. যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণ মাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্চে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্ব-প্রকৃতি লোক-সমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে শান্তং শিবং অদ্বৈতং মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানি নে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং অদ্বৈতং এই দুই-এর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলতে গেলে, **law** এবং **love** এর পূর্ণতাই হচ্চে সমাজের **welfare**.*

* যাত্রী, পৃঃ ১৬০।৬১

Law এবং Love-এর পূর্ণতার সাধনা-ই মানুষের সাধনা, অল্পে মানুষের মন ভরে না, ভরতে পারে না। সমাজজীবনে আজ পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি, তা নিতান্তই অল্প, তাই মানবসমাজে গতির শেষ নেই, দ্বন্দ্বের শেষ নেই। দ্বন্দ্বের শেষ নেই—এ-কথা যেমন সত্য, দ্বন্দ্বটা দ্বন্দ্বেই শেষ নয়, দ্বন্দ্বের অন্তরে আছে মঙ্গলের মহাভাস, এ-কথাও তেমনি সত্য। বহির্দ্বন্দ্ব থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বে, অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মননজাত নিবিড় অভিজ্ঞতায়, অন্তশ্চেতনার দিব্যমহিমার মহালোকে, আবার সেই আলোক থেকে দ্বন্দ্বাতীত সামঞ্জস্যের ধ্যানগভীরে —মানুষের মন চলে,—চলে, চলে আর চলে। তার দ্বারা যা সে পায়, প্রকাশ করে ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে। সমাজের তখন রূপান্তর ঘটে। কথাটা শুধু দার্শনিক তত্ত্ব নয়, ঐতিহাসিক তথ্য-ও বটে। সমাজজীবনে শ্রেয় যদি কিছু দান করতে পারেন, সমাজ তার প্রভাবে কিছু-না-কিছু প্রভাবিত হবে-ই। সে-শ্রেয়তার আয়ুষ্কাল যতখানি, সমাজে তার ততখানি-ই মূল্য; আয়ু যেই ফুরাবে, আপনার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কেউ আপনার জীবনধর্মের বিরোধী-তত্ত্ব নিয়ে আসবেন। দ্বন্দ্ব জাগবে, কিন্তু পরিশেষে আবার ঘটবে সামঞ্জস্য। চলবে এইভাবে চিরকাল।

তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে—সব কিছুর অতীতে সামঞ্জস্যটাই গন্তব্য। গতিপথে যা' করি, স্বভাবতই তা' অপূর্ণ, তাই তার অন্তরে দ্বন্দ্ব, তার পরিবর্তন হবে-ই, যুগে যুগে হয়, কিন্তু গন্তব্য সেই পরমমঙ্গলটি আজ-ও-না-পাওয়ার মধ্যে চিরসত্য হয়ে থাকবেন। নিত্যদ্বন্দ্ব, বিপ্লব, উপপ্লব, মীমাংসা, শান্তি, অশান্তি, আস্তিক্য, নাস্তিক্য—প্রভৃতি ভাব ও কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ সেই আজ-ও-না-পাওয়া মঙ্গলটির পথে চলেছে। এই চলার গুণেই মানুষ সবার বড়, তার বড় আর কেউ না, আপনাদের এই সমাজ-ও না।

অথচ এই মানুষের ওপর-ই সমাজ ও রাষ্ট্র এতকাল প্রভুত্ব ফলিয়েছে; বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে ঃ মানুষেরা সমাজের অধীন, সমাজের ইচ্ছাতেই তাদের ধর্ম, কর্ম, অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব! এখানে, বলাই বাহুল্য, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনোই মূল্য নেই। সমাজ যদি বলে, ওঠো—তো উঠতে হবে, যদি ব'সো—

হতো বসতে হবে। ব্যক্তিবিকাশের স্থান নেই সমাজ-থিসিসে। জাতি যখন পরাধীন থাকে তখন এই থিসিস-ই নিয়ন্ত্রণ করে মানবসমাজ। এ-ভাবে অবশ্য বেশিদিন চলে না—অ্যান্‌টিথিসিসের চেতনালোক উদিত হওয়ামাত্র মানুষ বুঝতে পারে, সে কী, কী সে চায়। তখন সংগ্রাম সুরু হয়। তারপর সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর সমাজ যদি জন্ম গ্রহণ করে যেখানে সমাজ মানুষের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য, তবেই law এবং love-এর আনন্দ জাগে, সমাজের সত্যকার welfare সম্ভব হয়।

কবির সমাজচেতনা তথা মঙ্গলচেতনার আধুনিক ব্যাখ্যাটি এই। বলাই বাহুল্য, কবির সমাজে মানুষকেই হয়ে উঠতে হবে,—আজ পর্যন্ত সমাজে যত কিছু পাপ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির নিন্দা করেই কাজ সারলে চলবে না, যথার্থ সামাজিকের মত আত্মসুখত্যাগের দ্বারা সমাজপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের জীবনে-ই। ···সমাজ আমাকে এতকাল ঠকিয়েছে, অতএব সমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করব না, ছলেবলেকৌশলে তাকে পরাভূত করব, লুণ্ঠন করব, শোষণের প্রতিশোধ নেব শোষণের উৎসাহে—এই যে জিগীষাবোধ, এর দ্বারা সমাজ হয়তো পরাভূত হবে, কিন্তু আমার চিত্তোন্নতি সম্ভব হবে না। কালে জিগীষুচিত্তের অহংবিকারে আমি প্রভুত্বলিপ্সু হব, মানুষকে সমাজনীতির বন্ধনে বদ্ধ রেখে' ঠকাব, শোষণ করব, শাসন করব। সমাজের যে-দোষে আমি বিদ্রোহী হয়েছি, সেই দোষটি আমাতে বিকশিত হলে পর—মানুষ একদা আমার নীতির বিদ্রোহী হবে, আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না, মারবে। এইভাবে মারমুখী মন এবং মারণাস্ত্রই প্রবল থাকবে সমাজে। 'শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'।

অপরপক্ষে—সমাজের সব দোষ জেনে-ও ত্যাগের দ্বারা, মহত্ত্বের দ্বারা, দুঃখভোগ ও কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা যদি তাকে রূপান্তরিত করতে যাই, হৃদয় পরিবর্তনে যদি তপস্যা করি অন্তরে-বাহিরে, বিলম্ব হয়তো হবে, কিন্তু সাফল্য পাব একদিন। যেদিন পাব, সেদিন মানুষ শিখবে—সমাজ থেকে আমরা পেতেই শুধু আসি না, দিতে-ও আসি,—এবং দিতে-আসাই মানবজীবনের সাধনা।

দিতে-চাওয়ার আনন্দের নাম প্রেম ঃ রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার উৎসভূমি এই প্রেম। এসেছি দিতে, চলে যাচ্ছি দিতে-দিতেই। এই দেয়ার ভাবটিকে আপনি ধর্মচেতনা-ও বলতে পারেন। ধর্মহীন সমাজ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করতে পারেন না, সমাজবোধবিহীন ধর্মচর্চা-ও তাঁর তত্ত্বদর্শনে অপ্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম অবশ্য, না বললে-ও চলে, আনুষ্ঠানিক কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, ইউরোপ যুগে যুগে যে 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিয়েছে—সেই অভিনব রাজনৈতিক ধর্ম নয়।[১] কোনো সাম্প্রদায়িক হিসাবে মানুষের একটি বিশিষ্ট ধর্মতন্ত্র ও জাতি থাকতে পারে, কিন্তু "ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র একজিনিস নয়।"[২] সামাজিক হিসাবে মানুষকে সংযত, শোভন ও রুচিসুন্দর হতে-ই হয় এবং মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়াটাই সব থেকে বড় কথা।

> এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজ-ই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।[৩]

কেন হয় না? না, মনুষ্যত্বের তাতে হানি হয় বলে। কূটনীতিক ব্যাপারটা আসলে, মনুষ্যত্ববিরোধী। এ-যুগে ছদ্মবেশী অনেককে দেখেছি, দেখেছি সাম্যবাদী কি গান্ধীবাদী, সমাজী কি কংগ্রেসী—দলগড়ার ও ভোট-পাওয়ার, অবশেষে প্রভুত্ব-পেয়ে নিজমূর্তি ধারণ করার অভিপ্রায়ে দরিদ্রের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্রু বর্ষণ করে, কত মিষ্টিকথা বলে, বচনের ছন্দ-তরঙ্গে ভাসিয়ে আনে সুখস্বপ্নের কত স্বপ্নভেলা, ইচ্ছা হয় তাতে চড়ে বসি, পাছে শুনতে হয় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী'—তাই আগে থাকতে টিকেট কিনি ভোট দিয়ে কি জোট পাকিয়ে! কিন্তু যাদের ডাকে এই ভোট-দেয়া কি জোট-

১। স্বদেশ ঃ ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।

২। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, পৃঃ ১৮

৩। কালান্তর ঃ লোকহিত দ্রষ্টব্য।

পাকানো—মুহূর্তে-ও জানতে চাই নে তারা, কারা, কেন আমাদের ওপর তাদের হঠাৎ প্রেমের প্রাণোচ্ছ্বাস! গৃহে তাদের অতুল ঐশ্বর্যের অমিত ঔদ্ধত্য, শহরে একাধিক বাজহর্ম, হর্মে লজ্জাকর লীলাবিলাসের সজ্জাহীন রূপবৈচিত্র্য, গ্যারেজে নিউ-মডেলের নানা মোটব, মোটরে নানাদেশিনী নববিলাসিনী, ব্যাঙ্কে নামে-বেনামে অঢেল টাকা, বিশ্ব-কোম্পানীর নানামহলে নানান শেয়ার, অভাব নেই বলেই অভাব-রচনার নানা ভাব উর্বর মস্তিষ্কে—এমন ইনি যখন অভাবগ্রস্ত দরিদ্রসমাজেব পুরোভাগে দাঁড়িয়ে 'সাম্য' গান—কি 'অহিংসা' করেন, 'সমাজ' ধবেন—কি 'শ্রমিক' বলেন—তখন ভাবে গদ্‌গদ্ না হয়ে উপায় থাকে না। তখন বলি, কত বড় উনি—আর কত ছোট আমবা, তবু কী আশ্চর্য প্রেম, আমাদের কোলে এলেন নেমে !····

রসিকতা থাক। দবিদ্রের যদি বন্ধু, যদি সাম্যধর্মে সত্যই বিশ্বাস, বিশ্বাস যদি অহিংস প্রেমে—ত্যাগ করুন দেখি সর্ববিধ ব্যক্তিবিলাস, বাড়ী-গাড়ী-আসবাব-পত্র, দান করুন দেখি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স দেশজনেভ্যঃ, স্পষ্ট করে বুঝে নিই আপনার মানবধর্ম, আপনাব সাধুত্ব। মানুষ হিসাবে প্রকাশ করুন আপনার সত্যস্বরূপ, ভাবতবর্ষ অচিবাৎ আপনাকে গ্রহণ করবে নেতা বলে'—চাই কি দেবতা বলে'। তখন ধর্মের কথা আপনি যদি স্বীকার না-ও কবেন, তবু বলব, আপনি ধার্মিক; তখন প্রেমকে ভাববাদ বলে যদি উড়িয়ে দিতে-ও চান, তবু বলব আপনি মানব-প্রেমিক। ব্যক্তিস্বার্থ একটু-ও ছাড়বেন না, ব্যক্তি আর গোষ্ঠীব জন্যে কেবলি অভিসন্ধি করবেন, কববেন সাম্য কি বলবেন অহিংসা—এটা আব যাই হ'ক মানবিকতা নয়, সেই হেতু ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের বিচাবে, যে-সত্য মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব উদ্বোধনে সহায়তা করে, সেই সত্যই ধর্ম। তা ধরে-ই মানুষ মঙ্গলকে জানে, অদ্বৈতকে চরিত্রে প্রতিভাত করে।

সমাজ আজ এই অদ্বৈতচেতনা থেকে বহুদুরে, তাই সাম্প্রদায়িকতা তথা গোষ্ঠি-প্রেমিকতা প্রকট হচ্ছে নানাভাবে, মানুষের মধ্যে যে মহাত্মা, সে জাগরিত হওয়ার পথ পাচ্ছে না সেই কারণে। আজ—

> আমরা তো নকল মানুষ। অনেকটা মানুষের মতো। ঠিক মানুষের মতো খাওয়া দাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমাই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই। কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে-জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সে-জাতির কেহ মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিতে পাবে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরি মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না, সেখানে সংকল্প কার্য হইয়া উঠে, কার্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়। সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে-জাতিতে সৌন্দর্য ফুলের মতো ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মতো পক্বতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে—আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জীবন লাভ করিবেন। *

মহত্ত্বসাধনাই ধর্মসাধনা, মানবসাধনা। সমাজে নানাভাবে, নানা প্রকারে মানুষ মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে। কিন্তু সকল কিছুর মধ্যেই বৈরাগ্যপ্রেমের ধ্যানটি থাকা চাই। এটি নেই তো গতি নেই।

গতি যদি সত্য—তবে জীবনে আজ যাকে বিধিগত, নীতিগত, যুগগত সত্য বলে' জানছি, তা' সাময়িক সত্য মাত্র, চিরন্তন সত্য কিছু নয়। গতির জগতে চিরন্তন সত্য ব'লে' কিছু নেই—দ্বান্দ্বিক বিজ্ঞানের এই হ'ল শেষ সিদ্ধান্ত।

এ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা আছে, ভারতীয় ঋষিদের কথা। ঋষিরা বলেন, জীবনব্যাপারে গতি যেমন সত্য, চিরন্তন ধ্রুব-ও তেমনি সত্য। এই ধ্রুবকে তপস্যার দ্বারা পাওয়া যে যায় না তা নয়, তবু তর্কের খাতিরে না-হয় স্বীকার করা গেল—ইহজীবনে ধ্রুব-ট্রুব কিছু নেই, সেইজন্য তা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। কিন্তু মানুষের জাতটা যে চিরটা কাল ধরে চলেছে, আর চলেছে, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য, না নয়? তর্ক করে যদি বলেন, না, তবে তো কথা ফুরিয়েই গেল, বোঝা গেল মানুষ ধ্রুব একটা পেয়ে গেছে, তাই আর চলছে না, থেমে গেছে শান্ত হয়ে। তর্কটা এইভাবে ঘুরে এল দেখে যদি বলেন, না-না, মানুষ চিরটা কাল ধরে চলছে, কিছুএকটা পাওয়ার জন্যে, কেবলি চলছে, তবে নূতন প্রশ্নটা হবে—সেই-

* সমাজ, পৃঃ ১৮৬,

কিছুটা কী বস্তু ? আজ যা পেয়ে-আছেন, তা-ই-ই কী ? তা অবশ্য-ই নয়, কেননা আপনার চঞ্চল অতৃপ্তি-ই প্রমাণ করে দিচ্ছে—যা-পেয়ে আছেন, তা' অতি অল্প—অনেকের তুলনায় তা কিছুই যেন নয়। তবে কাল যা-পাবেন, তাই-ই কী ? কাল যা পাবেন, তাতে যদি সত্যই মন ভরে, আর চলতে না চান, তবে আপনার জীবনে তাই হবে ধ্রুব। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি, থামবার মানুষ আপনি নন, অল্পে তুষ্টি নেই আপনার। তবে তো মনে হচ্ছে—অনাগত কালে-ও যা আপনি পাবেন, পাওয়ার আগে হয়তো মনে করবেন, তা বুঝি ধ্রুব, কিন্তু পাবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ যাবে বিস্তৃত হয়ে, তখন গতিরাগের মহাকাল আপনার ইহজীবনের অপূর্ণতাকে স্পষ্টতর করে' দেখাবেন বলে' প্রখরতর, তীব্রতর হবে আপনার যৌবনবেগ। তখন বিপুলবলে আপনি চলবেন—যা সব থেকে বড় তার-ই সন্ধানে, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্' বলতে বলতে চলবেন। যা পান নি বলে' কেবলি চলবেন, যা পাবেন তা-ও কিছু নয় বলে' কেবলি যা-র সন্ধানে চলবেন, সেই বস্তুটি কী, কী তার আস্বাদ—হয়তো জানবেন না কখনও, কিন্তু সেই অভিনব অদ্ভুত না-পাওয়া-বস্তুটিকে জীবন থেকে একবার বাদ দিয়ে ভেবে দেখলেই বোঝা যায়,—জীবনটা কোনো-না-কোনো কালে একটা-না-একটা জায়গায় এসে ঠেকে যাচ্ছে, আর চলছে না। চলাই যদি সত্য, তবে 'চলছে-না' তো ধাতে সইবে না। তবে-ই না-পাওয়ার টানে চলুন, কেবলি চলুন 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা'। সেই না-পাওয়ার টানে পথে-পথে আপনি কত কী-পাওয়া-ই পেয়ে যাবেন, বিরোধ এসে সে-সমস্ত পাওয়া-কে কালে এসে হয়তো নয় করে দেবে, মীমাংসা এসে কিছু-বা সাম্যাবস্থা আনবে, তবু শান্তি মিলবে না গতিবিধানেব। কিছু পেয়ে যে পূর্ণ হবেন, তৃপ্ত হবেন, শান্তি পাবেন—ইহজীবনের সেটা তত্ত্ব-ই নয়। তবেই তো বোঝা যাচ্ছে—যা পান, পেতে পারেন, পেয়ে থাকেন, তার জন্যই শুধু গতি নয়, আজ-ও-যা-পান নি, লোকজীবনে কখন-ও যা-পেতে পারেন না—গতি তার-ও জন্য। ঋষিরা সেই নিত্য অথচ না-পাওয়া বস্তুটিকেই পরমপ্রভূত বলেছেন, তা' 'অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'—তা' বৃহত্তমেরো বৃহত্তর, তা' ব্রহ্ম, অর্থাৎ তার চেয়ে আর বড় কিছু নেই। লোকজীবনে প্রেমের মধ্য দিয়ে সেই বড় তত্ত্বটির কিছুটা আস্বাদ আমরা পাই মাত্র। কবিগুরু

সেই বৃহৎ তত্ত্বটিকে প্রেম নামেই অভিহিত করেছেন। ব্রহ্ম সর্বত্র। প্রেম সর্বত্র। প্রেম সর্ববিশ্ব। কবিবিচারে তা-ই ভূমা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনে এই ভূমাটি পূর্ণভাবে মেলে না, তাই আপনি পূর্ণ হতে পারেন না, সেই হেতু থেমে থাকতে-ও পারেন না। তা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নি কখনও—এইজন্য তা' অসত্য ভাববাদ মাত্র, এই বলে' বৃহতের বিপুল বিস্তৃতি থেকে বঞ্চিত হতে চান, হ'ন, মুরুব্বিয়ানা-ও করতে হয় করুন, কিন্তু কিছুতেই যে আপনার শান্তি নেই, অহরহ আপনার অগ্রগতি, যৌবনদীপ্ত ডায়নামিক মৃত্যুমহত্ত্বে চঞ্চল আপনি জিগীষু জীবনপান্থ—এই প্রত্যক্ষ সত্যটি চিরন্তন সেই বৃহত্তম না-পাওয়াটিকেই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত করছে!

বাস্তব এই সমাজজীবনে-ও সেই না-পাওয়াটির প্রভাব বর্তমান। এই কারণেই আপনার-আমার মধ্য দিয়ে সমাজ চলে। অন্যায় দেখে আপনি ক্ষিপ্ত হন, প্রতিবাদ করেন, সংগ্রাম করেন এই কারণে, যে, ন্যায় সম্বন্ধে আপনার একটি ধ্যান আছে, আদর্শ আছে। সেই ধ্যান বা আদর্শ যদি সমাজে প্রতিভাত দেখতেন, আপনার শান্তির বোধকরি সীমা থাকত না। সেই ধ্যান আজ-ও না-পাওয়ার বেদীমূলে পূজা দিচ্ছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সংগ্রামঘোষণা সেই পূজা। এই পূজা-ই প্রমাণ করছে আপনার সমাজচেতনা, চেতনার উৎস মানবপ্রেম, জীবনপ্রেম।

প্রেমটিকে বাদ দিন, মানুষকে কলেকৌশলে পাষাণ করে দিন, দেখবেন গতি নেই সমাজজীবনে। গতি নেই, তাই অ্যান্‌টিথিসিস্ অর্থহীন, সিন্‌থিসিসিস্ সুদূরপরাহত। প্রেমের গতিভঙ্গেই দ্বান্দ্বিক চলমানতা। প্রেম নেই তো দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্ব নেই তো নিরুদ্দেশ যাত্রা নেই, যাত্রা নেই তো অতীতের স্মৃতি নেই, সুদূরের স্বপ্ন নেই।...

মানুষকে তাই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হয়ে উঠতে হয়, সাধক হয়ে উঠতে হয়। অর্থাৎ শুধু প্রেমিক হলেই হয় না, প্রেম হতে হয়। সর্বগত প্রেম সীমিত

জীবনে মানুষ পায় না, এটা ঠিক ; কিন্তু যতটা সে হয়ে ওঠে ততটা তো পায়। মানুষ যেমন, প্রেম তেমন। যদি 'থিসিসে'র স্থিতি, প্রেম তবে গতিবিরোধী প্রাপ্তির মৌন ; যদি 'অ্যান্‌টি'র অশান্তি, প্রেম তবে স্থিতিনাশন দুর্বার যৌবন ; যদি স্থিতি-গতির মীমাংসা, প্রেম তবে সর্বগতের মহিমাভাস। সর্ব-কে কতটুকু ধারণ করেন, আপনি-ই জানেন, যতটুকু করেন, ততটুকুই আপনার প্রেমসাধনা।

'পূরবী-পাঠ-প্রসঙ্গে প্রেমসাধনার এই তত্ত্বটি স্পষ্ট করে জানতেই হয়। চিরন্তন মানবমহিমার যে আশ্চর্য সৌন্দর্য পূরবীতে ব্যঞ্জিত হয়েছে, প্রেমসাধনার তত্ত্বটি উপলব্ধি না-করা পর্যন্ত তার আস্বাদ সম্ভব নয় বলেই জানি।

অবশ্য আধুনিক সমাজে প্রেমসাধনা একটা কথার কথা মাত্র। প্রেমে চরিত্র নির্মল হয়নি, এইজন্য মানুষকে এখন-ও যথোপযুক্ত মর্যাদা আমরা দিতে শিখি নি। মুখে আমরা শান্তির বাণী আউড়াচ্ছি, কার্যে এ্যাটম বোমার পরীক্ষা নিচ্ছি, হাইড্রোজেনের হুম্‌কী ছাড়ছি,—ছলেবলেকৌশলে বিশ্বপৃথিবীকে পদানত করে' বিজয়ী হতে চাইছি এ-যুগে-ও। বক্তৃতায় ও গ্রন্থরচনায় আমরা বিশ্বমুক্তির তত্ত্ব সমর্থন করছি সত্য, কিন্তু প্রেম আমাদের কৃত্রিম অর্থাৎ কলুষিত বলে' সাধারণ মানুষ—যাদের নিয়েই এই বিশ্বসমাজ, তাদের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য—করার মত কিছুই করতে পারছি না। সংশয় ও সন্দেহের বহ্নি তুষের আগুনের মত মানবসমাজে আজ জ্বলছে ; কোন্‌দিন বিসুভিয়াসের বিদ্রোহ নিয়ে তা ফুটে বেরিয়ে পড়বে পৃথিবীর চারি চত্বরে—মনীষিমহলে এই ভয়। তবু কি শক্তিপ্রমত্তের দম্ভ কমছে, কমছে 'দুঃখ দেবার বড়াই' ?

পূরবী-কবির সতর্কবাণী এই জায়গায় ঃ

> প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই
> জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
>
> —চিঠি।

তাৎপর্য এই ঃ প্রতাপকে পরাজিত একদা হতে-ই হবে। মানুষের পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ দেয়ার দম্ভ প্রকাশ করে' তুমি পার্ পাবে, বিধির এটা বিধান

নয়। জয় চাও, প্রেম দাও। না দিতে পারো, অন্ততঃ সংযত হও, কিন্তু দুঃখ দেয়ার বড়াই করে' শান্ত মানুষকে অশান্ত করে' তুলো না। মরবে।

যুগে যুগে প্রবলেরা এইভাবে মরেছে। পৃথিবীতে যত অত্যাচারী রাজা, আত্মম্ভরী যত ডিক্টেটর—সকলকেই মরতে হয়েছে একভাবে। প্রবলপ্রতাপী ইংরেজ ভারতীয়ের ওপর যখন-ই দুঃখ দেয়ার বড়াই করেছে, তখন-ই তার সরে-যাওয়ার সময় এসেছে ঘনিয়ে। বিধির সঙ্গে লড়াই করে' বিজয়ী হয় নি কেউ। অমন যে অমরকল্প হিরণ্যকশিপু—সে-ও নয়; অমন যে ত্রিভুবনজয়ী দশস্কন্ধ রাবণ সে-ও নয়; ভীষ্মদ্রোণকর্ণাদিপরিবেষ্টিত অমন যে মহাপ্রতাপী দুর্যোধন—সে-ও নয়। ইংরেজ তো কোন্ ছার।

ইংরেজের প্রসঙ্গ তুলছি, কিন্তু পুনর্বার গাল দেয়ার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই নয়। পূরবী-কাব্যের সমাজচেতনামূলক কতকগুলি কবিতার ঐতিহাসিক তথ্যবিচার-প্রসঙ্গে ইংরেজের নামোত্থাপন স্বাভাবিক।

যে-সময়ে পূরবী লেখা, ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায়, সে-সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্বসমাজের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি তখনো পূরণ করা সম্ভব হয় নি; মানুষের মন অবসাদগ্রস্ত, শান্তিকামনায় ব্যাকুল হয়েছে পৃথিবীর জনসাধারণ। তবু বিচিত্র কথা এই সেই সময়েই বিশ্বরাষ্ট্রের একাধিক কর্ণধার নবসমরের প্রস্তুতি করছেন গোপনে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, নূতন একটা মহাযুদ্ধ যেন হবে-ই হবে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিবাণী ইউরোপের জনসাধারণ আকুল আগ্রহে গ্রহণ করছেন—কিন্তু ফ্যাসিষ্ট্ কর্ণধারেরা তাতে কর্ণপাত করছেন না, বরং উপেক্ষা দিচ্ছেন, কোনো কোনো জায়গায় কবিকে অপমান করছেন প্রত্যক্ষে না-হলেও পরোক্ষে।* এদিকে ভারতবর্ষে মুখোস খুলেছে সাম্রাজ্যবাদের 'দুঃখদেবার বড়াই'। ভারতবর্ষ তখন মরীয়া হয়ে লড়াই সুরু করেছে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'নন-কো-অপারেসন মুভমেণ্ট্' সুরু হয়ে গেছে, নেতাদের সঙ্গে দলে দলে জেলে গেছে,

* Dr. A. Aronson রচিত Robindranath Through Western Eyes দ্রষ্টব্য।

সেলে গেছে বাঙালী, মার খেয়েছে, খাচ্ছে, শয্যাশায়ী হচ্ছে, অনশন করছে, মৃতপ্রায় হয়ে ছাড়া পাচ্ছে, ছাড়া পেয়ে তাড়া খাচ্ছে, এইজন্য-ই বুঝি সাড়া জাগছে যৌবনে, ফিরে দাঁড়াচ্ছে সত্যকে সাক্ষী রেখে, 'বন্দে মাতরম্' বলে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে সংগ্রামে, শির হয়তো দিচ্ছে, কিন্তু সার দিচ্ছে না।

ইতিহাসের এই পটভূমিকায় 'পূরবী'র যে-কটি কবিতা লেখা হয়েছে— সেগুলিতে কাব্যত্ব যদি না থাকত, প্রেমের কবিতা হিসাবে সেগুলি রসোত্তীর্ণ চিরন্তন শিল্পরচনা যদি না হত—অর্থাৎ স্বাদেশিক প্রচারকার্যের হুংকারে সেগুলি শুধু যদি বক্তৃতা মাত্র-ই হত, তবে দীর্ঘ এই অধ্যায়-রচনার প্রয়োজন বোধ করতাম না। পূরবী-কাব্য ঋষি-জীবনের গভীবতর ধ্যানের রহস্য-ই প্রকাশ করেছে, তবু এর মধ্যে যে বস্তু-পৃথিবীর সমাজকথা আছে, অনাচারের প্রতিবাদ আছে, এর দ্বারা এটা বোঝায় না, যে, রবীন্দ্রনাথো কাব্যে প্রচারবাদটাকে উদগ্র করে তুলতে চান; বরং এব দ্বাবা এটাই বোঝা যায়, যে, কবিগুরুর জীবনতত্ত্বের তথা কবিতাতত্ত্বের এবং প্রেমতত্ত্বের মূল আদর্শটি কী! ঋষিজীবনের মহত্ত্বমাধুর্যে উন্নীত যে-প্রেম, তার তপস্যা কি আত্মরতির ভোগসৌন্দর্যে? না। মঙ্গলের মহত্ত্বমাধুর্য ধূলির জীবনেই আনতে হবে, প্রতিভাত করতে হবে— এইটেই হল প্রেমের তপস্যা। পূরবীর সমাজসচেতন কবিতাগুলিতে-ও প্রেম-তপস্যাব এই ধ্বনি।

ইতিহাসের প্রভাবে কবির কবিতা, না, প্রেমতত্ত্বের আনন্দবেদনায় কবির কবিতা—আধুনিক কাব্যবিচারে এ একটি প্রশ্ন। ইতিহাসকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েই বলি, মহৎ কোনো কাব্য সব সময় ইতিহাস থেকেই যে আসে, এটা আমি মনে করি নে। জোর করে' যদি বলেন, আলবৎ আসে, মহা মহা পণ্ডিতেরা বলেছে, আসে, সর্বোপরি আপনি বলছেন আসে—তখন কী আর করব, বিনীতভাবে বলব, আসে তো আসুক, কিন্তু আসানোর আগে তাকে কবিতার জাতে-ই তুলে-নেয়ার সৌন্দর্যসাধনা যেন হয়: ইতিহাস থেকে বিষয় নির্বাচন করার স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই আছে, কিন্তু ইতিহাসের অন্ধকার থেকে

যে-কবিতাটিকে আলোয় আনবেন সে-টি যেন কবিতা-ই হয়। কবিতায় ইতিহাস আমুন, রাজনীতি আমুন, অর্থনীতির তর্ক আনতে হয়, তা-ও আমুন— কিন্তু কবি বলে' আপনাকে তখন-ই স্বীকার করব, যখন কবিতাটিকে আপনি কবিতা-ই করে তুলতে পারবেন।

পূরবীর সমাজসচেতন কবিতাগুলি আগে কবিতা, পরে যুগসমস্যার বিষয় ব্যাপার। সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের কাঠামোর মধ্যে এগুলি অবশ্যই পড়বে না, সমাজীরা এগুলিকে তাই তেমন কোনো মূল্য-ও হয়তো দেবেন না। কিন্তু কবি কি কোনো সমাজীর পরামর্শ নিয়ে কবিতা লিখবেন, অগম চেতনরাজ্যের বসন্তলোক থেকে দক্ষিণার যে-মন্ত্রবাণী গুঞ্জরিত হয় অহরহ—তার ছন্দে তিনি কি সুর ধরবেন না আর?

না, কেউ না ধরুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরবেন। 'মেসিন গানের সম্মুখেই' 'জুঁইফুলের গান' ধরবেন। এইজন্য তাঁর সমাজচেতনা শুধু মাত্র সাময়িক সিদ্ধিসাধনেই স্ফূর্তি পেতে পারবে না, তাঁর সর্ববিধ চেতনাই চিরন্তন জীবনশিল্প রচনায় হবে নিয়োজিত। প্রেম-ই তাঁর সর্ববোধের উৎসভূমি বলে সমস্ত বিষয় ও বিচারকে তিনি ঘুরে-ফিরে প্রেমের পাদপীঠেই নিয়ে যাবেন, ফলে তাঁর সমস্ত কথা কবির কথাই হবে, সমস্ত চেতনা কবিতার রসচেতনা রূপেই হবে প্রতিভাত।

আসলে রাজনীতিকের সমাজচেতনা ও কবির সমাজচেতনা এক বস্তু নয়, এক তত্ত্ব নয়। এই মোটা কথাটা আমরা বুঝতে পারি না বলেই—রাজনৈতিক সমাজচেতনার ফরমুলাগুলোকে কবিতায় এনে প্রগতি করি, অরসিকদের বাহবা পেয়ে মাথাটা খারাপ-ই করে বসি।...কবি যে-অংশে মানুষ, সে-অংশে অবশ্যই তিনি 'সমাজ' করতে পারেন, 'রাজনীতি' করতে পারেন, 'ধর্মনীতি'ও করতে পারেন। কিন্তু মানুষ যে-অংশে কবি, সে-অংশে তার স্বতন্ত্র একটা কর্ম-ও আছে, তাকে বলি কবিকর্ম। এই কবিকর্ম চিরন্তন রূপরচনার আনন্দকর্ম, এর ধর্ম আলাদা, তত্ত্ব আলাদা। রাজনীতিকের সমাজ-

চেতনা আশু প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হতে পারে, হয়ে-ও থাকে কিন্তু কবির সমাজচেতনা সনাতন রূপলোক সৃজনে ব্যাপৃত না হয়ে পারে না। কবি বলে—শিল্পের সৌন্দর্যে এ-যুগের সমাজবোধকে চিরযুগের করেই যদি না দিতে পারি—তবে তা নিয়ে কবিতা করি কেন, বক্তৃতা-ই তো করতে পারি।...আসলে বক্তৃতা করাটা রাজনীতিকের কাজ, ধর্মপ্রচারকদের কাজ, বড় জোর অধ্যাপকদের, লোকশিক্ষকদের কাজ। কবিকে একহিসাবে লোক-শিক্ষক অবশ্য বলতেই পারেন, কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে—তাঁর শিক্ষার ধারাটি কি রীতিটি একেবারেই স্বতন্ত্র। কবি যা' করেন, তার দ্বারা শত শিক্ষকের কাজ পরোক্ষে হয় তো সম্পাদিত হয়ে থাকে—কিন্তু এই গুণেই যে কবি, কবি—তা' মনে করি নে। চলমান জগতে চিরন্তনের আনন্দ পরিবেষণ করাব প্রতিভা আছে বলেই কবি, কবি। সব যায়, কিন্তু কবিতা থাকে, কবিতা যে প্রেম, সেই চিবন্তনের স্বর্গমহিমা, তাই থাকে। সংসারে যা-কিছু আসে, যায়, হচ্ছে, হবে—সব কিছুই হতে পারে কবিতার সামগ্রী, যদি সত্যকার কবির হাতে তা' পড়ে। একজন ব্যাধ একটা পাখী মারল, কত-ই তো মারে, কিন্তু সত্যকার একজন কবির চোখে একদিন তা' পড়ল বলে'—সর্বনাশ, কবিব শোকাবেগের প্রেমস্পর্শে জিঘাংসার সেই নির্মম ছবিটি কালের কপোলতলে চিরন্তন হয়ে রয়ে গেল!...ইংরেজের অনাচার ও অত্যাচারের ছবি কত চিত্রকবি কত ভাবেই তো অংকন করেছে, কিন্তু ররীন্দ্রনাথেব হাতে পড়ে তা' সহসা সকল কালের কবিতা হয়ে উঠল। ইংবেজের বিরুদ্ধে কত জননায়ক, কত ধর্মবেত্তা, কত রাজনীতিক কতভাবে কত কথাই না বলেছেন, আজ তার একটা কথাও বুঝি মনে নেই, যা আছে, কালে ক্রমশঃ তা' ধুয়ে যাবে, মুছে যাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 'চিঠি' কবিতায় অনাচারী ইংরেজ অমর হয়ে কালের কাছে অহরহ নিন্দিত হবে।

'চিঠি' কবিতাটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা—বুয়েনোস এয়ারিস থেকে, তারিখ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ দানবীয়তার বিরুদ্ধে ক্রোধান্ধ দানবীয়তা নয়,

নির্ভীক মানবীয়তার প্রেম-সংযম-ই যে অব্যর্থ অস্ত্র—এবং এর দ্বারাই জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করব একদিন—'চিঠি'তে 'জুঁইফুলের' ভালোবাসা গেয়ে কবি ইঙ্গিতে তা' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আশ্বাসবাণীটি এই: শক্তির দম্ভ দুদিনেই নিঃশেষিত হবে, কিন্তু প্রেমের শক্তি অমৃতের সন্ধান দেবে চিরকাল:

যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা
সেদিনও তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাই-এর রক্ত ছিটোয় যারা
লড়বে তারা চিরটা কাল? গড়বে পাষাণকারা?

আজ তারা লড়ছে, পাষাণকারা গড়ছে, কিন্তু কাল তাদের কী হবে তারা কি জানে? 'রাজপ্রতাপের দম্ভে' তারা ভাবে বুঝি—প্রভুত্বের গদিটি রক্ষা করতে পারবে চিরকাল, ক্ষিপ্তের মত তাই তারা 'ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে' আসে ছুটে, প্রেম বা অহিংসনীতির মর্যাদা রাখে না, 'শান্ত হবার' করে না 'সাধনা', 'গায়ের জোরের প্রভু' তারা, ধর্ম মানে না, ঘোরতর অধর্মের দেয় প্রশ্রয়,—দেশের যাঁরা প্রেমিক তাঁদের পীড়ন করে, দেশের যাঁরা মানী, তাঁদের অপমান করে, দেশের যাঁরা শক্তি, তাঁদের জেলে পোরে, সেলে শাস্তি দেয়, অলংকারে যাঁদের ভূষিত করাই দরকার, তাঁদের হাতে পরায় শিকল—

কাণ্ড দেখে পশু পক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে
অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

মহাকাল অনন্ত, মানবিকতার ক্ষণিক এই অপচয়ে তাঁর এমন কিছুই ক্ষতি হবে না। লাভের মধ্যে হবে এই: প্রভুত্বদম্ভী দানবদল নিজেদের মারণাস্ত্র নিজেদের গায়েই ছুঁড়বে, মরবে। ইতিহাসের শিক্ষাই এই।

টুটল কত বিজয়তোরণ, লুটল প্রাসাদ চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে কবে
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।

আজ ফুলের মূল্য নেই, মূল্য নেই রসরূপের, প্রেমবোধের। তবে কি হাল ছেড়ে দেব? নৈরাশ্যে নির্জিত হয়ে নাস্তিক্যের অন্ধকারে আত্মবিক্রয় করব? না। কবির বিশ্বাস এই: 'ফুলের সবুর সবে'; 'প্রেমের সবুর সয়'। একদিন সময় অবশ্যই আসবে যখন মানুষ এর মূল্য বুঝবে, মহিমা উপলব্ধি করবে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় মানুষকে আজ তপস্যারত হতে হবে: মানুষ হতে হবে অন্তরে-বাহিরে। দানবের সঙ্গে দানব হয়ে যে-যুদ্ধ, সে-যুদ্ধে কোনো একদল দানবেরি জয় হয়, তাতে মনুষ্যত্বের অর্থাৎ প্রেমবোধের জয় সূচিত হয় না। দানবের সঙ্গে মানবের যুদ্ধে মানুষের জয় যদি বিলম্বে-ও হয়, বুঝতে হবে, একটা হওয়ার মত কিছু হ'ল। দুঃখের দুর্দিনে দানবীয়তায় আত্মবিক্রয় না করে' প্রেমের প্রতীক্ষায় সবুর সইতে পারা-ই বীরত্ব। বাঙালী আজ নির্ভীক বিক্রমে জয় করুক দুঃখকে, মৃত্যুকে বুক পেতে গ্রহণ করে' মৃত্যুঞ্জয় হ'ক প্রেমের মহিমায়:

> দুঃখ সহায় তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়—
> ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
> মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারে-ই টানে,
> মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুঃখবিজয়ী প্রাণ অমৃতকে পাবে—এই যে চেতনা—পূরবী-কাব্যের এই জীবনচেতনাকেই বলি মানবচেতনা! সমাজচেতনা! এই চেতনার আনন্দটি যিনি উপলব্ধি করবেন, চরিত্রে প্রতিভাত করবেন এর আদর্শ, দুঃখে শোকে আঘাতে অপমানে নির্জিত হয়ে-ও তিনি অন্তরে হবেন অমৃতের সন্তান, বাহিরে হবেন যথার্থ সামাজিক। তখন তিনি বুঝবেন —মেসিন গান্-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে-ও আত্মবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মানবমাহাত্ম্য রক্ষা করার মত বীরত্ব—সমাজে আর কিছুই না।

পূরবী-কবির সমাজচেতনা তথা মানবচেতনায় এই বীরত্ব। মৃত্যুবোধের প্রসন্নতায় জীবনচেতনার গাম্ভীর্যটি এখানে খুবই স্পষ্ট। মৃত্যু তো আসবেই একদিন, তবে কেন ভয় করে', শক্তিমত্তের মো-সাহেবী করে' আত্মবিক্রয় করি

অমানুষের মত ?—এই প্রশ্ন পূরবীর। বলা হল—আত্মবিক্রয় করব না, মানুষ যদি, মানুষের মত কাজ করব। কবি যদি, গ্রহণ করব কবির কর্ম। স্বভাব ও শক্তি অনুসারে কাজ করে' যাব নিভৃতে, মৃত্যুবোধের আনন্দে। কবি হয়ে জন্মেছি, মানুষের ভবিষ্যতে রাখব বিশ্বাস। আজ না-হয় সৈন্য-দলের 'কুচ্‌কাওয়াজ' চলেছে আকাশের তলায়, যুদ্ধধ্বনি উত্থিত হচ্ছে মহাদম্ভে, ভালো লাগছে না এসব। বলছি ঃ

> নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
> তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্র পাইপ-নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
> ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম ;
> গুলিগোলার ধড়্‌ধড়ানি, বুকের মধ্যে থর্‌থরম্‌।
> —শিলঙের চিঠি।

তবু মনে মনে জানি—পৃথিবীটা তেমন অসুন্দর নয়, আর ভবিষ্যৎটা তার অন্ধকারেই নয় সমাচ্ছন্ন। আসলে গণনা যদি করা যায়, পৃথিবীতে ভালোর সংখ্যাই বেশি বলে' জানা যাবে ঃ

> আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য—
> মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
> —শিলঙের চিঠি।

শত-করা সাতান্ন জন সত্যসত্যই শান্তি চায়, প্রেম চায়, শিল্প চায়, গতি চায় জীবনের আনন্দে। তাদের আশা খুবই ছোট, তাদের ভালোবাসা খুবই নিবিড়। বড় মানুষ যারা, ক্ষোভে লোভে আঘাতে প্রত্যাঘাতে শোষণে শাসনে জীবনকে অশান্ত করে যারা, ছোট আশা আর ছোট প্রেমের অমিতবিত্ত আনন্দ তারা বুঝবে না, বুঝবে না এই তত্ত্ব ঃ ছোট আশা শুনতে ছোট, শুনতে সহজ, আসলে তা' তপস্যার ধন,—বহুসাধনায়, প্রেমসাধনায় তা মেলে ঃ

মনে ভাবি চাইলে পাব ; যখন তারে চাহি
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
তদ্রূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।
—আশা।

ফুলের গুচ্ছ পর্বতপ্রমাণ বস্তুবিশ্বের অতুল বিভবের তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু বহুযুগের স্বপ্নসাধনার আনন্দ আছে এই সৃষ্টির পশ্চাতে। ছোট আশা পোষণ করে শান্তিতে থাকতে পাবে সে-ই, মানসিক প্রেমমহত্ত্বের তপস্যা আছে যার চরিত্রে, যে জানে ধনে নয়, মানে নয়, কীর্তিতে নয় শান্তি, শান্তি আছে মনের সমাহিত সন্তোষে, আছে এই নিবিড় বিশ্বাসে, যে, জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসাকে ভরে তোলার জন্যে একটু নির্জন বাসা, একটু নির্মল ধ্যান, একটু নিশ্চিন্ত প্রেম-ই যথেষ্ঠ।...সন্তোষের সাধনা যেখানে নেই—বস্তুবিভব ও যশো-বিভবের মোহে সেখানে প্রবল আসক্তি, শান্তির জন্যে আশা সেখানে ব্যর্থ। মনের শান্তি কি যা-তা কথা, এর জন্যে কত তো আশা করি, কিন্তু পাই নে কেন? না, যথার্থ সামাজিক আমরা নই, শান্তির পরিবেশ করি নে রচনা। যুগসমস্যার নানাবন্ধনে বন্দী হয়ে এ-সম্বন্ধ আমরা হারিয়েছি বহুকাল।...আজ আমরা শান্তি ছাড়া সব চাই, ধন চাই, মান চাই, পদ চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, প্রভুত্ব চাই। এ-সব চাওয়া যে খুব একটা মন্দ ব্যাপার তা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু এ-সব চাওয়ার প্রভাবে ও পরিণামে মনুষ্যত্বকেই যদি বিকিয়ে দিতে হয়, তবে এ-সব মন্দ-ই বটে। মানবত্বে পূর্ণ বিকাশ-ই হল প্রেমসাধনা, শান্তিসাধনা, সেই প্রেম ও শান্তি যদি জীবন থেকে তথা সমাজ থেকে দূরে গেল— তবে কী হবে মান দিয়ে, ধন দিয়ে?

কিন্তু থামি। ভাববাদের বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছি। সাম্প্রতিক সমাজে বুদ্ধিমানেরা এ-সব মানে না, একবার ভাবে-ও না। ছলেবলেকৌশলে তারা ভোট চায়, জোট চায়, নানাফিকিরে, যে-কোনো উপায়ে হ'ক—গদি চায়। আর গদি যদি পায়, তবে তো 'বিজয়ী' তারা, 'দৃপ্তবেগের বিজয়রথে' তখন

ছুটতে থাকে, ভাবে চিরকাল থাকবে এই গদির প্রভুত্ব, এ-থেকেই জ্বলবে আত্মপ্রতিষ্ঠার 'মশালশিখা' যা নয় 'কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা' মাত্র।

> ভাবল তারা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
> মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
> জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
> ভাবল তারা, এই শিখারই ভীষণ বলে
> রাত্রিরানীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে,
> অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
> নিত্যকালের বিত্তরাশি ;
> ধরিত্রীরে করবে আপন ভোগের দাসী।
> —বিজয়ী।

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রভুত্বদম্ভী অসামাজিকেরা এই আশা করেছে, সমাজকে মেরেছে, নিজেরাও মরেছে। এই আশা তো ছোট আশা নয়, প্রচণ্ড আশা ; মানব-আশা নয়, দানব-আশা। 'ধরিত্রীকে ভোগের দাসী' করার এই উদ্ধত আশা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেশীদিন অবশ্য স্থায়ী হতে পারে না। নিয়তির বিধানে মহাকালের প্রলয়ঙ্কর সংহারমূর্তি ওঠে দুলে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মহত্ত্বে দানব-আশার ঘটে অপমৃত্যু।

যক্ষপুরীর সিংহাসন আগলে কেউ-ই চিরকাল থাকবে না—যেতে হবেই। কাঙালের ধন লুঠে অন্যায় আশায় যারা প্রশ্রয় দিল,—মায়াচ্ছন্ন তারা, মানব-চেতনার অভ্যুদয়ে একদিন তা' তাদের বুঝতে হবে। পূরবী-কাব্য এই মানব-চেতনার গান : মৃত্যু অপরিহার্য, অতএব প্রেমে হও বিজয়ী—এই গান। এ-গানের আনন্দচেতনা আহরণ করে' মানুষ হবে মহান সামাজিক, অহং থেকে প্রেমের মহত্ত্বে সমুত্তীর্ণ হয়ে লোকসমাজে সঞ্চার করবে শুভবুদ্ধি—পূরবী-কবির এই আশা। এ-আশার ভাষাটি কেমন ? তা' কি এই, কিংবা এই রকম :

> বহুদিন মনে ছিল আশা—
> অন্তরের ধ্যানখানি
> লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
> ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
> করেছিনু আশা ?
> —আশা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবিতা ঃ বসন্ততপস্যা

কাকে বলি ভালো কবিতা ?

না, যা' আমাকে রসের চেতনায় নূতন মানুষ করে নেয়, যা-আছি তা থেকে মুক্ত করে দেয় নির্জনে, যা-হব তার আকাশে সূর্য করে নেয় জ্যোতির আনন্দে।

কথাটা পণ্ডিতের মত হল না, বোধকরি এ-কালের কোনো সমজ্‌দারের মত-ও হ'ল না। ভালো কবিতা সম্বন্ধে আমার মতটা, যেমন কবিতাবিচারের পথটা, ঠিক এ-কালের মত নয়। হয় আমি একাল থেকে অনেক যুগ পেছিয়ে আছি--নয় বহু যুগ এগিয়ে আছি।

এগিয়ে আছি কি পেছিয়ে আছি—বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এটা আমার সমালোচকদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে কী বলতে চাই, যাই বলে'।

বলতে চাই—ভালো কবিতা বলি কাকে।

আগেই অবশ্য তা বলেছি। যা বলেছি আমার বিচারে, তা সত্য। অনুভব করে দেখেছি ঃ ভালো কবিতা কখনো আমাকে বস্তুবোধের সীমার মধ্যে স্তব্ধ রাখতে পারবে না, বাস্তব আমি-কে সর্বত্বের আনন্দে মুক্ত করে নেয়-ই নেয়। যদি দরিদ্র, আমাকে ইশারা দেয় অন্তহীন ঐশ্বর্যের; যদি অভাবী, আমাকে উদ্দীপ্ত করে ভাব-ভুবনের অনন্তাকাশে, যেখানে সুনীল রহস্যের সংখ্যাহীন গ্রহতারার সমাহার, যেখানে অগম স্বপ্নবিস্ময়ের অননুভূত রোমাঞ্চ।

জীবন থেকে এ কি নিষ্ক্রমন, আধুনিক ভাষায়, ভীরু পলায়ন ? সর্বজীবনে নিমজ্জিত হয়ে, অভিস্নাত হয়ে নবজীবনে এটা উজ্জীবন নয় ? শম্বুকবৃত্তি-ই

জীবন, জীবন নয় আকাশচারিতার আনন্দোন্মুক্তি ?...এত ছোট মানুষের জীবনটা ? আর এই নিয়ে এত প্রগতি, এত আস্ফালন, এত অহঙ্কার ?

স্বীকার করছি—আমি একালের নয়, কেননা এককাঠা এতটুকু ছোট জীবনের মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করায় আমার লজ্জা। এ-লজ্জা থেকে বাঁচতে চাই। কবির কবিতাই আমাকে বাঁচাতে পারে, বাঁচায়।

রসের আনন্দে চিত্তের মুক্তি এনে দেয় কবির কবিতা, কবিতাকে তাই, কানে হাত দিতে হয় দিন, আমি ঋষিবাণী বলেই তৃপ্তি পাই। কবিকে আমি ঋষি বলি। অন্তরের গভীরে ঋষি নন তো কবি-ও নন আপনি। 'নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যম্'—অঋষির দ্বারা কাব্য হয় না, দেবী ভাগবতের এ-বাণী আমি মানি, শ্রদ্ধা করি।

কবিতা আলোচনার প্রসঙ্গে ঋষিসাধনার কথা সাম্প্রতিক যুগে নিতান্ত সেকেলে বলেই পরিত্যক্ত হবে। যে-যুগে বস্তুঘটিত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও হৈ-চৈ-করাটাকে প্রগতির পরাকাষ্ঠা বলে ব্যাখ্যাত হচ্ছে—সমাজচেতনা বলতে রাজ-নৈতিক বিধি-প্রভাবিত অহং-চেতনার উগ্রতাকেই আমরা বুঝতে চাইছি—সে-যুগে ঋষিসাধনার আনন্দটি বহুনিন্দিত ভাববাদের পর্যায়ে পড়বে যে, তা' আমি জানি। তবু বলি—কবিতা রাজনীতি নয়, রাজনীতির ক্রীতদাসী তো নয়ই, এমন কি এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সাহস করেই বলতে পারি, কবিতা নয় বস্তুবিশ্বের কোনো জ্ঞানসমস্যা, কোনো মীমাংসা, কোনো বিচারতর্ক বা তত্ত্ব-বিজ্ঞান। কবিতা কী এটা বোঝাতে গিয়ে জ্ঞানের আশ্রয় নিই, স্থির কোনো মীমাংসার প্রশ্রয় দিই, বিশেষ কোনো বিচারের দোহাই-ও পাড়ি, ভাবভাষাশব্দছন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিষয়ের আলোচনা-ও করি উত্থাপন, কিন্তু মনে মনে জানি—কবিতা এ-সব থেকে অনেক দূরে, তা' মানবিক ভাবপুলকের প্রয়োজনে লাগলেও, মানবিকতার মুক্তিবিলাসে-ই তার বিকাশনা, বাস্তবমন ও বোধের অতীতে চেতনঘন বেদনাস্বাদের আনন্দকমলে তার লঘুপদক্ষেপ। যে-কবির যেমন সাধনা, যেমন শক্তি, আনন্দের সেই উৎসভূমি থেকে তেমন সিদ্ধি, তেমন সাফল্যের সুধাই সে আহরণ করতে পারে। যতটুকু পারে, ততটুকুতেই

তার পরিচয়। এ পরিচয়, বলাই বাহুল্য, পূর্ণের আভাস আনতে পারে, কিন্তু পূর্ণ নয়। তাই যা পাই তাতে মানবিক মন হয়ত তৃপ্তি পায় কিন্তু মনের মনে কোথায় তবু যেন অভাব থাকে। রসের ব্যাপারে অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। মনোলোকে অবশ্য ভূমা মেলে না, তাই দুঃখ। এ-দুঃখ, বস্তুবিকারের যাতনায় নয়, ভূমার সাধনায়, তাই আনন্দ। এটি যার যতটুকু পাওয়া হয়েছে ততটুকু তার গতি, তার সন্ধান।

সংসারে কবিতা নামে আজ পর্যন্ত যা লিখেছি, সবই সন্ধানের আনন্দ। অথচ গন্তব্য যে-হেতু পূর্ণের আনন্দে, শুধু মাত্র সন্ধানের নয়, কবিতা লেখা কিছুতে ফুরায় না, ফুরাবে না। অন্তরে মানুষ যত গভীর হবে, অতলস্পর্শী ভাবসমাধির অরূপমণি আহরণে জীবনের জীবনে ডুব দেবে, ততই বুঝবে—এতকাল কবিতা করতে গিয়ে যা' করেছি—লোকজগতের লোককান্ত চিত্র-বিষয় তা হয়তো হয়েছে, কিন্তু লোকোত্তর মহাজীবনের স্বর্ণাবিষ্কার সম্ভব হয় নি।

স্বর্ণাবিষ্কারে যাঁর আনন্দ, তিনি ঋষি। এ-আনন্দ-বিকাশনায় যার বাণী-সাধনা, তিনি কবি। সত্যকার কবি হতে চান, ঋষিত্বের সাধনা আপনাকে করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথকে একসময় একজন আর্টিষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আর্টের সাধনা কী? উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন ঋষিসাধনার ব্যাপারে-ও কতকাংশে তা প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ

> 'আর্টের সাধনা কী? আর্টের একটা বাহিরের দিক আছে সেটা হচ্চে আঙ্গিক, টেকনিক, তার কথা বলতে পারিনে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তাহোলে সমস্ত চিত্ত দিযে দেখো, দেখো, দেখো।
>
> অর্থাৎ বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ ক'রে ধরা দিতে পারে তাহোলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়—আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে-পাওয়া মানে হচ্চে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা একজিনিষ আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিষ। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্চে আর্টিষ্টের সাধনা—তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিক পদ্ধতি তার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা

করতে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে। সহজ-স্রোতকে আটক ক'রে রেখে কষ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিনীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে—এই হোলো গোড়াকার কথা ; এই হোলো বর্ষণ, তারপরে তোমার যদি আধার থাকে তো ভরে উঠবে—এই হোলো আগুন, প্রদীপ বের করতে পারো যদি তো শিখা জ্বালবার জন্যে ভাবনা থাকবে না।*

তা, আপনার আধারটি কেমন? তাতে ছটাকখানেক ধরে, না ষোল ছটাকে-ও ভরে না? আপনার প্রদীপটি কত বড়? শিখা তার দলের কোঠরে-ই টিম্‌টিম করে, না, আকাশ ফেঁড়ে-ও ওঠে আরো আকাশে?

বড় আধারের সাধনা, সূর্যপ্রদীপের সাধনা কি করতে হবে না? মানুষের যদি বন্ধু, তবে মানুষের জন্যই যে আপনাকে ঋষি হতে হবে। 'অল্প' হলেন, 'ভুমা'কে ভাববাদ বলে' দূরে পরিহার করলেন, যুগজীবনের কয়েকটা সমস্যার গরম কথা শুনিয়ে সস্তায় কিস্তী মাত্‌ করলেন, বাহবা পেলেন, কিছু নাম-ও বুঝি হল—এতে বন্ধু হিসাবে আমি তৃপ্ত হতে পারি, কিন্তু রসিক হিসাবে পারি না। ভারতবর্ষের আমি মানুষ। আমার কাছে 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি'।

কিন্তু ভূমাসুখের পথে যাই কি করে'? না, সাধনা করছি, কায়েন-মনসা বাচা করছি সাধনা, তবু তো পাচ্ছি না সেই প্রভুতের পরমসুখ—এই যে দুঃখ, এই দুঃখ-মহিমার আনন্দ উপলব্ধি করে'। মনোজীবনে একটি মাত্র সম্পদ আছে যা এমনি অভিনব যে, এড়াতে যাই তো তা' পেয়ে বসে, পেরোতে পারি তো মুক্তির, সেই প্রভূতের, ইঙ্গিত আনে। তার নাম দুঃখ!

মৃত্যুর মত দুঃখ-ও নিয়ত সত্য—মনোজীবনে। দুঃখ করি না দুঃখ আছে বলে'। বরং ভাগ্যের বিষয় এটা, যে, দুঃখ আছে। দুঃখবোধ নেই তো 'সুদূরের পিয়াসা' নেই। পার্বতীর দুঃখবোধ তাঁকে উত্তীর্ণ করল উমার তপস্যায়; শকুন্তলার দুঃখবোধ তাঁকে বৈরাগিনী করল প্রেমসিদ্ধির প্রার্থনায়;

* যাত্রী পৃঃ ১৬২।৬৩

বুদ্ধের দুঃখবোধ তাঁকে নির্বাণমহিমায় করল প্রসন্ন; চৈতন্যের দুঃখবোধ তাঁকে কৃষ্ণবিরহে করল সুদ্দীপ্ত! কী হ'ত, যদি দুঃখ না থাকত—যদি একটানা সুখমোহে বুঁদ হয়ে এই সীমিত জীবনের প্রাপ্তটুকুকেই সর্বস্ব মনে করতাম। দুঃখ আছে, তাই হ্যাঁ, অশান্তি আছে—কিন্তু সেই কারণেই গতি আছে, আছে গন্তব্যের সন্ধান।···গন্তব্য মেলে না, মনের মত সুখ-ও তাই মেলে না, তাই মনের আকাশে নিত্যবেদনার সূর্যোদয়।···দুঃখ যার, আলো তার ঃ অন্ধকারের গভীর গহনে জ্যোতিরভিসার তারি। অন্যকথায় দুঃখ যার, জীবনে জয়ে তারি অধিকার। মননজাত নিত্য অভিজ্ঞতার সুযোগে তত্ত্বজ্ঞতার আশীর্বাদ পাবে সে-ই।

দুঃখ তাই আনন্দ নয় তো কী!

পূরবী-কাব্যের শেষের দিকে 'বদল' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা আছে, দুঃখের আনন্দ তার ধ্বনি।

কবিতাটি পাঠকসমাজে খুব পরিচিত নয়, কিন্তু জীবনতত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় স্মরণীয় এবং প্রণিধানযোগ্য।

ইহজীবনে সুখ বা 'হাসি' হচ্ছে সীমিত জীবনের সাময়িক প্রাপ্তি বা ভোগের আনন্দ। লোকবিচারে দুঃখ-ও অবশ্য তা-ইই—যে-দুঃখ নিছক ব্যক্তিগত দুঃখ, তার গতি এক ফার্লঙ্-ও অবশ্য নয়। তবু দুঃখের মহিমা এই ঃ অহংগত সাধারণ দুঃখ-ও মনকে ক্রমশঃ ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিবোধে জাগাতে-ও পারে, সুখ কিন্তু তা পারে না। সুখ যখন পাই, আত্মসুখের রসগভীরে অহং-আস্বাদে থাকি প্রমত্ত, তখন আমার মত সুখী যারা, তাদের-ও স্মরণ করে' যে সুখ বাড়াই তা নয়; বরং এমনটাই হতে পারে, আমার চেয়ে যারা সুখী, তাদের স্মরণ করে, কেমন যেন পীড়া অনুভব করি, ফলে সুখ যায়, দুঃখ আসে। দুঃখ যখন আসে তখন আমার মত দুঃখী যারা, আমার চেয়ে-ও দুঃখী যারা—অবচেতনের সূক্ষ্ম পথ বেয়ে তারা স্বপ্নে যেন ভেসে আসে,—অকারণ কোন মোহের টানে বড় আপনার বলেই তাদের মনে হয়, সমবেদনার আকর্ষণে চিত্ত তখন বিস্তৃত হয়,

হৃদয় হয় বেগবান। দুঃখের এই মনস্তাত্ত্বিকতা যাদের জানা, বিশ্বকে হৃদয়ের মধ্যে সত্য করে পাওয়াব জন্যে দুঃখকে স্বেচ্ছায় তাঁরা বরণ করেন। তাঁরা জানেন—দুঃখ নেই তো তপস্যা নেই, আব তপস্যা নেই তো চিত্তের বিকাশ নেই—অগম আনন্দলোকের স্বপ্নসন্ধান নেই।

'বদল'—কবিতাটিতে এই তত্ত্বসত্য কথিকাচ্ছন্দে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ

সুন্দবী রমণী ডালি ভবে আনলেন 'হাসিব কুসুম' আব আমি আনলাম 'দুখবাদলের ফল'। প্রশ্ন করলাম ঃ আমি যদি তোমাব ফুলটি নিই, আর তুমি নাও আমার ফল, তবে হাব হবে কাব? সুন্দবী শুনে' বললেন ঃ আগে বদল কবি এসো। পরে দেখা যাবে কার হাব হল, কাব হল জিত।

সে লইল তুলে আমাব ফলেব ডালা
কবতালি দিল হাসিযা সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহাব ফুলেব মালা
তুলিযা ধবিনু বুকে।

ভাবলাম হাসিব কুসুম মালা পেযেছি, জয হল আমাবি। কিন্তু কী বিচিত্র, আমার দুখবাদলেব ফলটি বুকে কবে' নিযে 'মোব হল জয' বলল হেসে, তাবপব আরো বিচিত্র কথা, সে থামল না, দাঁড়াল না মুহূর্তকাল

দূরে চলে গেল ত্বরা।

কুসুমভোগেব প্রবল উদ্দীপনায় যাপিত হ'ল প্রমত্ত মধ্যাহ্ন—মধ্যগগনে তপন উঠে এলে মার্তণ্ডতাপের মাধ্যন্দিন স্পর্শপাতে কুসুমগুলি কি বিশুষ্ক হল? কবি জানালেন ঃ

উঠিল তপন মধ্য গগন দেশে
আসিল দারুণ খরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

বুঝলাম সুখহাসির ফুল ঝরে যায়, আর যায় বলেই দুখবাদলের ফল ফলে। হাসির কুসুমবিলাস আজ আছে কাল নেই, চলমান জীবনে এর চিরস্থায়িত্ব কামনা করা মূঢ়তা।

হাসির কুসুম নিতে চেয়ে আমারি তা'হলে হার হল। হার হয়ে যে-দুঃখ, মননজাত গভীর অভিজ্ঞতা তার লক্ষণা। এই লক্ষণার আলোকে 'বদল'-কবিতার বক্তব্যটি স্পষ্ট হল। বোঝা গেল ঃ কামী বা কামিনীর কুসুমবিলাস ঝরে যায়, খরে যায়, কিন্তু দুখবাদলের ফল যে চিরন্তন, কবির দান তাই বেঁচে রইল,—বেঁচে রইল গতির প্রেমে, প্রেমিকের আনন্দে।

অতএব নৈরাশ্য নয়, আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের দুঃখকল্পনার ব্যঞ্জনা আনন্দ। মানুষের জীবনে দুঃখতপস্যার আনন্দই সাধ্য-বস্তু।

সুখ যদি চিরন্তন হ'ত, তবে মোহগ্রস্ত মন এতটুকু আর অগ্রসর হতে চাইত না। জীবন অপূর্ণ, আমরা তাই কেবলি 'চাইতে চাই'—না-পাওয়ার টানে কেবলি এগোতে চাই। মধ্যে মধ্যে কিছু পেয়েছি বলে'—'কুসুম' কিছু পেয়েছি বলে'—থামি বটে, কিন্তু সময় গেলেই ভুল ভাঙে, তখন কান্নার বেগে বাদল নামে বুকে, দুখবাদলের ফল ফলে গোপনে।... প্রেমের আনন্দে দুখবাদলের ফলটি যে বুকে ধরতে জানে, সে আর থামে না, 'দূবে চলে যায় ত্বরা'। মুক্তি তার-ই অধিকারে!

জীবনে শোক আছে, তাপ আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে। এ-সবে যখন মুহ্যমান থাকি তখন আমি অহং মাত্র, ছোট-আমি মাত্র। এসব থেকে যখন উত্তীর্ণ হয়ে যাই, বুঝতে পারি, এ-সবে প্রয়োজন ছিল জীবনে ঃ দুঃখের সম্পদে চিত্ত তখন পূর্ণ হয়।

এটা ঠিক, দুঃখ যখন প্রথমটা আসে, নিদারুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠি—মনে করি, সান্ত্বনা বলে' কোনো পদার্থ-ই নেই পার্থিব জীবনে।...সান্ত্বনা নেই—এই নেতিভাবটা অবশ্য মোহের ভাব, প্রেমের নয়, প্রাণের নয়। একটু স্থির হলেই তাই বুঝতে পারি ঃ বাঁচার পিপাসা জাগিয়ে অন্তর-গহনে প্রাণ কথা কইছে, সান্ত্বনার অভীঃ-মন্ত্র করছে উচ্চারণ ঃ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত যায় ভরি
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বহন করিয়া আনে ; অমৃতের কণা
গলে আসে অশ্রুজলে।
—দুঃখসম্পদ।

অশ্রুর মহিমা তখন উপলব্ধি করি ঃ এ-উপলব্ধিতে অমৃতাস্বাদ সম্ভব হয়। অমৃতাস্বাদে যে-আনন্দ সেই আনন্দই জীবনের সর্ববিধ আবেগকে, দুঃখবেদনার আবেগকেও, আপনার পূর্ণ সত্তার মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়।

যে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।

আনন্দ যখন দুঃখকে আত্মস্থ করে' নেয়, অন্য কথায়—আনন্দের দৃষ্টিতে যখন দুঃখকে দেখি, তখন তার মহিমা আর লুকানো থাকে না ঃ

তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্ব্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি, আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।
—দুঃখসম্পদ।

দুঃখকে এড়িয়ে এই 'অমরাবতীর' সন্ধান অবশ্য মেলে না, তাকে পেরিয়েই অমরলোকের সন্ধান করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাবলীতে, পূরবী-কাব্যে তো বটেই, দুঃখকে পেরিয়ে-যাওয়ার মন্ত্রই ধ্বনিত হয়েছে।

এ-মন্ত্রটি কবি পেলেন কোথা থেকে? না, মৃত্যুবোধের প্রসন্নতা থেকে। পূরবী-কাব্য দুঃখ বা করুণরসের কাব্য, মৃত্যুবোধ এই রসের স্থায়ীভাব।

একটু থামি। মৃত্যুভয় ও মৃত্যুবোধ একবস্তু নয়—এটা বোধ হয় বলা দরকার। মৃত্যুভয় আসে বস্তুমোহের মায়া থেকে, মৃত্যুবোধ, একাধিকবার বলেছি, প্রেমবৈরাগের আনন্দ থেকে।...বস্তু সুখে আসক্ত হই, সে-সুখ তো থাকার নয়, যায়, তাই দুঃখ পাই; দুঃখের চেতনায় তখন বস্তুমোহে আর আসক্ত হই নে, মহত্তর দুঃখে তাই জন্মলাভ করি; মহত্তর দুঃখের আনন্দকে জানি, তাই নবতর জীবনের বেদনায় জেগে থাকি; জেগে থাকি, তাই অগম জীবনের ইশারায় আকুল হয় মন। এই মনের যে-ভাব, অলংকার-শাস্ত্রীরা যে-ভাবটি এখনো আবিষ্কার করেন নি, মৃত্যুবোধ সেই স্থায়ীভাব। এ-ভাব সকলের মধ্যেই আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে—সময় মত সবার মধ্যেই এটি জাগবে। এ-ভাবে চিত্ত উন্মেষিত হলেই এ-পার ও-পার দুপার-ই আমার। তখন এ-পারে আছি তো বেদনপ্রেম, ওপারে যাই তো, চেতনপ্রেম।

ভালো কবিতা এই প্রেমের কবিতা। পূরবীর কবি কবিদের কবি এই প্রেমের সাধনায়। অর্থাৎ দুঃখসাধনায় তিনি বেদনপ্রেমের লোককান্ত কবি; মৃত্যুমহিমায় তিনি চেতনপ্রেমের লোকোত্তর মহাকবি। সে-অংশে তিনি ঋষি। ক্রান্তদর্শী। বসন্ত-চেতনার মন্ত্রোদ্গাতা।

বসন্ত-চেতনার কথা উত্থাপন করলাম। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক, পূরবীতে একাধিক বসন্তকবিতা আছে বলে' নয়, দুঃখ ও মৃত্যুমহিমার সঙ্গে পূরবী-বসন্তের নিবিড় যোগ আছে বলে'। পূরবী-কবির উপলব্ধিতে মৃত্যু যেমন অমৃত, দুঃখ তেমনি বসন্তের আনন্দ।

অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন: বাঙ্‌লায় বসন্ত বড় মৃদু চরণে আসে, বড় দ্রুত পাদক্ষেপে চলে যায়। অল্পক্ষণ থাকে, কিন্তু অল্পসময়ের অবস্থিতিতেই আকাশ করে নীলকান্ত, গাছে গাছে ধরায় নব-পল্লব, নবকুসুম, গান আনে পরভৃতের কণ্ঠে, শরীরে জাগায় নবীন রোমাঞ্চ, মনে স্বপ্ন, হৃদয়ে বিরহ, আত্মায় কী-যেন-প্রাপ্তির প্রশান্তি!

বসন্ত ক্ষণকালের, তবু তার দান অনন্ত। মানুষের জীবনের সঙ্গে এর উপমা দেয়া চলে। মানুষের জীবন ক্ষণকালের। তা অপূর্ণ। অসমাপ্ত তার কর্মকৃতিত্ব। তবু এরি মধ্যে দুঃখের সাধনায় সে প্রেমের রহস্য ভেদ করে, রচনা করে ভাবের স্বর্গলোক ঃ রচনা করে শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন। অল্পকালের জন্য আসি, আসি তো চলে যেতেই, তবু আসা ও যাওয়ার মাঝখানে প্রিয়কে দেবতা করে' স্বর্গ রচনা করি মর্ত্যধামে, দেবতাকে প্রিয় করে মর্ত্যের মন্দিরে নামাই স্বর্গকে। অর্থাৎ যতদিন থাকি মর্ত্যকে স্বর্গোপম করার স্বপ্ন দেখি। দুঃখ আছে, শোক আছে, অন্যায় আছে, তবুও ভুবনকে সুন্দরভাবে করার তপস্যা-ও তো আছে!

পূরবীকাব্যে এই তপস্যা। বলব কি, এটি বসন্ত-তপস্যা, জীবনকে তথা জগৎকে রূপেরঙে রঙিন-করার তপস্যা? এ-তপস্যার এমনি বিপুলবীর্য, যে, মৃত্যুকেই নিয়োজিত কবি জীবনকে অমৃত-করার কর্মে?

জীবনকে অমৃত কবার দুঃখ অনেক। সেই সব দুঃখ পেরোতে পারলে মৃত্যুই অমৃত। দুঃখোত্তীর্ণ তপস্যাব উত্তরায়ণে বসন্তের আবির্ভাব।

সে-বসন্তের স্বরূপ কেমন?

ফাল্গুনের মোহ-মদির ভাবোচ্ছ্বাসে ভাবি বুঝি ভোগের আনন্দই বসন্তের স্বরূপ। আসলে বসন্তের স্বরূপ হচ্ছে ত্যাগে, দানে, নবজীবনের নিত্য-অভিসারে। ক্ষণকালের জন্যে বসন্ত আসে; রঙে-রঙে রঞ্জিত করে বিশ্বপ্রকৃতি। গান দেয় আকাশের মৌনে। রূপ দেয় অরণ্যেব যৌবনে। প্রেমাভাস আনে বাতাসের স্পর্শে। রহস্যালোক জাগায় প্রেয়সীর চোখের কালোয়।··· কত কী দেয় বসন্ত—কিন্তু বিচিত্র কথা এই—অন্তরে সে আনন্দবৈরাগী, প্রকৃতিকে নবীনস্বপ্নে উদ্দীপ্ত করেই সে উধাও হয় অসীমের অনন্ত তিমিরে, পিছে ফিরে দেখে না—কী দেয়া হল, কোন্ সম্পদ ধূলিতে পড়ে মাণ হয়ে উঠল ফুটে।

'পূরবী'কে যদি বসন্তের কাব্য বলি, তবে বলি এই দানমহিমার দুঃখোদ্বেজনায়। দান বলি কাকে? না, প্রতিদান পাওয়ার আশা না-রেখেই যে-দান, এমন কি দিতে যে পারি—এমনভাব মনে না-রেখেই আপনভোলা মধুরাবেগে যে-দান, দান বলি তাকে ঃ

পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে।
বাতাসেতে উড়িয়ে দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখী।
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।
—দান।

বসন্তের এই দান। পাওয়ার কথা তো বসন্তের নয়, যেমন প্রেমের নয়; দেয়ার কথা-ই বসন্তের, যেমন প্রেমের। পূরবীতে দেয়ার দুঃখবেদনার স্বর্গীয়োচ্ছ্বাসে বসন্তযৌবনের সত্যকার রূপটি আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রৌঢ় ঋতুর ফসল এই পূরবীকবিতাবলী—নিরপেক্ষ বিচারে এগুলিই সত্যকার 'বসন্তের ফুল'। কাঁচাবয়সে আমরা যে বসন্তের কবিতা লিখি, তাতে আর যাই থাক কেন, বসন্তের বৈরাগ্যশুচিতার ঋষিত্বটি থাকে না। ফলে বসন্তযৌবনের আসল রূপটি থাকে প্রচ্ছন্ন। যৌবন সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক যে ধারণা আছে, যে ভোগসন্ধী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছার বিহ্বলতা অনুভব করি যৌবনযন্ত্রণায়, তা' থেকে যতক্ষণ না উত্তীর্ণ হতে পারছি—ততক্ষণ মৃত্যুতে আমাদের ভয়, দুঃখে অরুচি, সেইজন্য বসন্তের দানমহিমা তথা প্রজ্ঞাগাম্ভীর্যের সৌন্দর্য আমাদের চেতনাকে স্পর্শই করতে পারে না। ভোগে যতক্ষণ আসক্তি ততক্ষণ বর্তমানটিকে অচল করে রাখাতেই আমাদের কামনা।···কবি বলছেন—আমার সে-কামনা নয়। যাবার সময় হলেই যাব চলে, দেরি করব না।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
—শেষবসন্ত।

বসন্তের বাণী-ই না এই ? যায় যখন, যায় নিঃশব্দে ! আসক্তির দৃষ্টিতে আমরা এটা দেখি বলেই—মনে করি এ-জীবনে বসন্তের সময় বড় অল্প। তাই কাঙালের মত কেবল হাহাকার করি, বসন্ত চলে যায় সেই হাহাকারের মধ্যেই, মোহান্ধকারে থাকি বলে বসন্তের আসা ও যাওয়ার তত্ত্বটি বোঝা সম্ভব হয় না। অন্ধভাবে অন্ধকারেই থাকি তলিয়ে। একে-ই বলি বার্ধক্য, মন ও মননের জরা এরই নাম।

কি জানি—একালের নবীনেরা একথাটা মানবে কি না, কিন্তু আমার তো মনে হয়—মনের জরামুক্তির সাধনা-ই হচ্ছে রসের সাধনা। রস যদি তিনি—রসো বৈ সঃ, তবে তাঁকে পেতে হলে, তাঁর আভাস দিতে হলে কবিকে রসিক হতে-ই হবে : আর সত্যকার রসিক হওয়ার অর্থ-ই হচ্ছে ঋষি হওয়া।...কবিকে ঋষি হতেই হবে : একমাত্র ঋষি-কবি-ই বসন্তচেতনার মন্ত্রোদ্গাতা। ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তাঁরাই অনন্তচেতনার অধিকারী করতে আসেন, অগমের সন্ধানদানে উদ্দীপ্ত করেন যৌবনকে, জীবনের যে-পথটি আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই পথটির আকাশে-ও সূর্য জ্বালেন অভিনব প্রজ্ঞাপ্রতিভায়। ঋষিকবির কবিতায় আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবন-ও বসন্তসূর্যের সোনার আলোয় ঝলমল করে ওঠে। তখন মনে হয়, প্রভাত এল, বনে বনে জাগল যৌবনের পুলকোল্লাস, কুঞ্জে কুঞ্জে মাতল সুর, গাছে গাছে ফুটল স্বপ্ন, পাতায় পাতায় নাচল আকাশের নীলিমা।

ভালো কবিতা কাকে বলি ? জীবনে যা' প্রভাত আনে।

পূরবী সায়াহ্নের সংগীত—কিন্তু জীবনের অভিমুখে এর সুরমহিমার যা' দান—বসন্তপ্রভাতের উদ্দীপনা তার ধ্বনি। বসন্ত চলে যায়, কিন্তু দানের মহিমায় সে যে আনন্দপ্রেম, তাই রেখে যায় নবজীবনের যৌবনরোমাঞ্চ ; জীবন চলে যায়, কিন্তু দুঃখ-তপস্যায় যদি বসন্ত হয়ে থাকেন অন্তরে, আপনি-ও রেখে যাবেন উত্তরকালের অভিমুখে অমৃত কবিতার বিচিত্র সম্ভার :

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে করে 'যাবে' দান
দূর কালে।

—সত্যেন্দ্রনাথ।

পূরবীকাব্যে দুঃখতপস্যার এই বসন্তাভিলাষ। এই প্রার্থনা: রিক্ত এই নিঃস্ব জীবনের অন্তর ভেদ করে আপনাকে যেন উন্মোচন করতে পারি, প্রকাশ করতে পারি বিশ্বজীবনের অমরমহিমা:

বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন।

—পঁচিশে বৈশাখ।

পরিশিষ্ট

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট ঃ কবিদার্শনিক

বিশেষ কোনো দর্শনশাখার অনুসারক না হলে-ও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ এক-শ্রেণীব দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যাকার বলে' আমি জানি। জীবনের নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে-সত্য তিনি আহরণ করেছেন, পরিণামে দেখা গেছে, ভারতীয় জীবনতত্ত্বের তা সাধু ব্যাখ্যা এবং স্বচ্ছ বিশ্লেষণ। ভাবতীয় দার্শনিকেরা বিশ্ববৈচিত্র্যেব মধ্যে পরম সেই একের সন্ধান-ই করেছেন, রবীন্দ্র-নাথের মন তথা কাব্যদর্শন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে একের আনন্দ পথেই পথিকের মত অগ্রসর হয়েছে। যে-অংশে রবীন্দ্রনাথ বিশেষের রূপ দেখেন, বলতে পারেন সে-অংশে তিনি কবি ; আবার যে-অংশে তিনি অশেষেব অরূপ সন্ধানে চলতে থাকেন, সে-অংশে তিনি দার্শনিক। কবি ও দার্শনিক এই দ্বৈতসত্তার অদ্বয় রূপটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঃ তাঁর কবিত্বে দর্শন, দর্শনে কবিত্ব। এইজন্য শুধুমাত্র কবি তিনি নন, কেবলমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক-ও নন তিনি। তিনি কবিদার্শনিক—তাঁর একসত্তা অপর সত্তাব পবিপন্থী নয়, পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অপরটি অন্ধ। ববীন্দ্রনাথের-দর্শন তাঁর কবিকথার বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-নাথেব কবিতা তাঁর দর্শনতত্ত্বের রসরূপ।

রূপের মধ্যে অরূপ বা সীমার মধ্যে অসীম-দেখার আনন্দ কবিদার্শনিকের আনন্দ! কবির মধ্যে দার্শনিকটি আছেন বলে' রূপবিশেষে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বে-ও অরূপেব আনন্দে না গিয়ে তিনি পারেন না ; দার্শনিকটির মধ্যে কবি-মানুষটি আছেন বলে' বৃহতে রতির অখণ্ড অনুধ্যানটি থাকা সত্ত্বে-ও শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধময়ী এই পৃথিবীকে মিথ্যা বলে' তুরীয়ানন্দে তিনি উন্নীত হতে চান না। পূরবী-কাব্যে তিনি 'অন্ধকার'-রাজ্যের যে-সূর্যমহিমা দেখেছেন, বলাই বাহুল্য, তা' অবাঙ্‌মনসোঽগোচর বিজ্ঞানানন্দের কোনো তটস্থ তত্ত্বব্যাপার নয়, তা' মনোজীবন তথা মননজীবনেরই বিশিষ্ট একটি ধ্যানগাম্ভীর্য। রবীন্দ্রকল্পিত

'অন্ধকার' সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ধকার হলে-ও মনোগত একটি সূর্যরূপ তার আছে-ই আছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের অরূপ কোনো নেতিতত্ত্বকে নির্দেশ করে না, তা অভিনব একটি রূপসৌন্দর্যের অভিনব ঐন্দ্রজালিক মায়া-ই বিস্তার করে। পূরবী-কাব্যে সন্ধ্যার সঙ্গীতে দিনজীবনের শেষে-ও নেতির কথা তাই উত্থাপিত হল না—দিনান্তসঙ্গীতধ্বনির আনন্দে নবতর একটি অননুভূত জীবন-স্বপ্নের বোধনা-ই উদ্দীপ্ত হল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু জীবনের মত-ই রূপময়, কান্তিময়। তাঁর বৈরাগ্য প্রেমের মতই প্রসন্ন ও জীবনবিলাসী। তাঁর মানুষ, মানুষ হয়ে-ও মানবব্রহ্ম, তাঁর ব্রহ্ম পূর্ণ হয়ে-ও কর্মসাধক। তাঁর 'অহং' মিথ্যা না হলে-ও 'আত্মার' আনন্দে মুক্তিকামী, তাঁর আত্মা অরূপসন্ধানে নিত্যগতি হলে-ও রূপসৌন্দর্যের উন্মেষণায় ক্ষণে ক্ষণে অহংবিলাসী। তাঁর দর্শন কবিতার সহজ-সৌন্দর্যে লোকায়ত, তাঁর কবিতা দর্শনের চৈতন্যে দিব্যজীবনের অভিসারিকা।

'সোনার তরী' থেকে 'পূরবী', তথা শেষ বয়সের সমগ্র কাব্যাবলী, অনুসরণ করলেই দেখা যায়—প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের গান তিনি গাইছেন, কিন্তু থেমে থাকছেন না কোথাও। অগ্রসর হচ্ছেন অনাগত একটি 'না-পাওয়ার' আকর্ষণে। কিন্তু এ-কথা বোধহয় না বললে-ও চলে. যে, রবীন্দ্রদর্শনে যোগী বা সন্ন্যাসীদের মোক্ষ বা সাযুজ্য-মুক্তির ধ্যান নেই, বাসনা-ও নেই। যদি থাকত, তবে বলতাম, কবি হিসাবে তিনি একথা বলেন, দার্শনিক হিসাবে বলেন আর কথা। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে দেখলেই, ধ্যান করলেই, বোঝা যায়—তাঁর মধ্যে কবি ও দার্শনিক—এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব আদৌ নেই। দার্শনিক হিসাবে তিনি ততটুকু তত্ত্ব-ই গ্রহণ করেন—যতটুকু তত্ত্ব তাঁর কবি মনো-জীবনের ধ্যান ও ধারণা থেকে আহরণ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, জীবনে প্রতিভাত করেছেন। মনের বাইরে তাঁর দার্শনিকটির গতিবিধি নেই, কবির তো নেই-ই! তাঁর দর্শনকে তাই বলেছি মনোদর্শন—অর্থাৎ তা' বস্তুদর্শন নয়, বিজ্ঞানদর্শন-ও নয়, তা' মধ্যগপথাশ্রিত লোকদর্শন, মনোদর্শন।

এই মন 'এখানে' আছে, এ যেমন সত্য, 'সেখানে' যেতে চায়, সেটা-ও তেমনি সত্য। মন অন্নে আছে, প্রাণে আছে, মনের বিচিত্র ভাবানুভাবে আছে, আবার

বিজ্ঞানের অখণ্ডত্বে গতি পাবার চেতনাতে-ও আছে। রবীন্দ্রনাথের মন কেন যে বিশ্বকে স্বীকার করে-ও বিশ্বকে অতিক্রম করতে চায়, রূপের মহিমা গেয়ে-ও উধাও হতে চায় অরূপের আনন্দে—এই তত্ত্ব থেকে তা' বোঝা সহজ।

কবিদার্শনিকের পক্ষে খণ্ডরূপ যেমন সুন্দর, বৈচিত্র্যের অন্তরে অখণ্ড তত্ত্ব-ও তেমনি সত্য। বস্তুতো বৈচিত্র্যের বিশ্বরূপে এক অদ্বিতীয় দর্শন, খণ্ডের অন্তর্লোকে অখণ্ড চেতনার আনন্দোপলব্ধি—কবিদার্শনিক, তথা মনোদার্শনিক-দেরই ভাব বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের যুগে ভারতবর্ষের চিন্তামানস 'নির্বাণ' তথা 'মোক্ষ'-দর্শনের আনন্দে প্রভাবিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু বৈদিক ভারতবর্ষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে মনোদর্শনে—অহংগত মনকে অখণ্ডসাধনায় আত্মাভিমুখী করার ধ্যানদর্শনে।

"ঐক্য নির্ণয়, মিলন সাধন, এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি লাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল" বলে' সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সমগ্রতার ধ্যানে, তার কর্মে, তার যজ্ঞ-আয়োজনে, তার ধর্মে, তার সমাজ বিধিব্যবস্থায় সে নিত্য মুর্তি ও স্ফুর্তি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষ, তাই, অতি প্রাচীনকালেই, স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিল, যে, সৃষ্টি যখন ছিল না, তখন-ও এই 'ইনি' এই অখণ্ড সত্তা, বিদ্যমান ছিলেন—(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত) এঁর থেকে যখন সৃষ্টি আবির্ভাবিত হ'ল, তখনও ইনি বিশ্বসৃষ্টির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রাণপুরুষরূপে নিত্য জাগরূক রইলেন (শ্বেতাশ্বত-রোপনিষৎ, ২য় অঃ ১৬।১৭)। "বৈচিত্র্যের মধ্যে ইনি, এঁর মধ্যে বিশ্ববৈচিত্র্য," —উপনিষদের কবি-ঋষিদের ধ্যানাকাশে এই সত্য সূর্যের মত প্রতিভাত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আপনজীবনের আনন্দ থেকেই এ-সত্য উপলব্ধি করেছেন —বেদোপনিষদ্ তাঁর উপলব্ধিকে দৃঢ়ীভূত করেছে মাত্র। রবীন্দ্র-দর্শনে এই তাঁর উপলব্ধির কথাই নানাভাবে, নানাছন্দে, নানাভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে 'চায়'—তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ 'পায়'।" রবীন্দ্র-দর্শনের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করতে হলে', প্রথমেই আমাদের বলে' রাখতে হবে, তিনি যে-আনন্দের কথা বলেন তা' সর্বত্র-ই মনোগত আনন্দ; তাঁর অমৃত মনোগত

আনন্দঅমৃত। তাঁর অখণ্ড নির্বিশেষ কোনো তুরীয়বিজ্ঞানের ধ্বনি বহন করে না। তাঁর মুক্তি মানসিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি। এইজন্য তাঁর মুক্তিবাদ সমাজজীবনের পরিপন্থী নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বৈচিত্র্যময় অসংখ্য সীমার মধ্যে অদ্বিতীয় এই মহান অসীম, এই অমৃত নিত্য বিদ্যমান আছেন—সুর দিচ্ছেন, সংশয় দুর করছেন, সীমাকে আপন অসীমত্বের অপূর্ব ইঙ্গিতে মধুর, কিনা অমৃত, করছেন (গীতাঞ্জলি)। এই যে ইনি, এই এক, এই অমৃত-অসীম, এঁর স্পর্শ বিশ্বের প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, মহান থেকে মহত্তর প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেই বিরাজিত। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তাই মিথ্যা নয়, বহুত্বের বিশ্ববিকাশ মায়া-প্রপঞ্চের বিবিধ বস্তু স্তূপমাত্র নয়। কেন নয়? না, এক থেকেই বহুত্বের বিকাশ; আবার বহুত্বের বিচিত্র রূপবৈশিষ্ট্য ভেদ করে' অমৃত এই একেরই সূর্য-প্রকাশ (চিত্রা)।

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, যে বেদোপনিষদ্ ঠিক এই কথাই বলেন। বলেন ঃ 'এক আমি, বহু হবো, এই বহু হলাম।' সূর্য প্রকাশিত হলেন বিচিত্র সপ্তরঙে, সপ্তরঙ তাই সূর্যের স্বীকৃতি পেল—সত্যের প্রকাশ সত্যই হবে, মনোদর্শনের বিচারে, মায়া হবে না, মিথ্যা হবে না। এক যখন বহু হলেন, তখন বহু অর্থাৎ সেই একের বিশ্ববিভূতি, দার্শনিক স্বীকৃতি আদায় না করে' ছাড়লো না। আবার অদ্বৈতদর্শন যখন বললেন, সবই ব্রহ্ম, সবই ইনি, তখনও বহুত্বের প্রতি ন্যায়শাস্ত্রীয় আস্থা ক্ষুণ্ণ হলো না। সবই যখন ইনি, এই সত্যস্বরূপ, তখন মনের বিচারে এঁর মধ্যে যা' কিছু আছে, সবই সত্য, সবই এঁর অমৃত-তত্ত্বের প্রতীক, প্রতিনিধি। এখন কথা হচ্ছে, এঁর মধ্যে যা' কিছু আছে সে সব কি?—না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই সূর্য-চন্দ্র-তারা, এই পুষ্প-গুল্ম-লতা-পত্র, এই সাগর-পর্বত-আকাশ-বাতাস, এই কীট-পতঙ্গ, জীব-বিহঙ্গ, খেচর-ভূচর-উভচর, অধোগামী ও ঊর্ধ-বিহারী।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তা'হলে সত্য। সত্য কি? না, সত্য হলো 'ভাব', মানে, যার অস্তিত্ব আছে। 'ম্যাটার'-ও মনের কাছে সত্য, কারণ তা তার ভাবসত্ত্বাকে

'বিশেষ একভাবে' প্রমুদিত করে। (বার্কলে) যা' সত্য, যার অস্তিত্ব আছে, তা' নিশ্চয়ই আমার ভাবসত্ত্বাকে পুলকিত করবে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, হয় বহির্দৃষ্টি, নয় অন্তর্দৃষ্টি। আমার 'বন-বাগানে' যে কুসুমটি আজ সকালে প্রমুদিত হয়ে হাস্য করছে, তা' সত্য এইজন্যে, যে তা' আমার বহির্দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ; আবার ক্ষুদ্র কুসুমটির প্রফুল্লআননের অন্তরালে যদি নিখিলব্রহ্মাণ্ডের শিল্প-সৌন্দর্যের বিভূতি দেখতে পাই, যদি চিত্ত উড়ে যায় পুষ্প দেখতে দেখতে পুষ্পাতীতে, তা'হলে পুষ্পটির আরো একটি গভীরতর গোপন সত্য আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে ; তখন বুঝতে পারি ওটি আমার অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আমার সৌন্দর্যভাবকে উদ্বেজিত করেছে, অরূপের রূপসন্ধানী আমার পিপাসু আত্মাকে অরূপে প্রমুদিত করবার অভিপ্রায়ে বিশেষ রূপাধারে বিকশিত হয়ে এসেছে।

এইভাবে বিশ্বনিখিল রূপবৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে ধ্যানসাধনায় অরূপের অমৃত-সাগরে স্নান করা, আবার, অরূপের আনন্দে অভিস্নাত হয়ে বিশ্বরূপমহিমার অমৃতোপাসনায় তন্ময় হওয়া—রবীন্দ্র-দর্শন-সাধনার উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সৌন্দর্য সত্যভাবে অনুভব করতে পারলেই রবীন্দ্রদর্শন বা কাব্য আর দুর্বোধ ঠেকবে না। সহজেই বুঝতে পারা যাবে, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তিনি "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির" মহারূপ নিরীক্ষণ করেছেন, আবার কোন্ বেদনায় ব্যথান্বিত হয়ে তিনি "রূপসাগরে ডুব 'দিয়েছেন' অরূপ-রতন আশা করি'।"

এই অরূপ অখণ্ডেরই শব্দান্তর, একথা বলাই বাহুল্য। 'খণ্ডের' এক একটা 'বিশেষ রূপ'-ই আমাদের ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সমস্ত খণ্ডকে,—আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডকে, একত্র করে' অনুপম অখণ্ডকে একস্থানে, একই কালে, সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়-দৃষ্টির দ্বারা দেখা সম্ভব না। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টি (perception) যেখানে পরাভূত, ধ্যান-দৃষ্টি (intuition) সেখানে মানুষকে সত্য-সন্ধানে সাহায্য করে। ধ্যান-দৃষ্টির সহায়তায় যাঁকে দেখি, তিনি "রূপে রূপে প্রতিরূপে বহিশ্চ" বিরাজিত। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে তাঁর পূর্ণরূপ দেখা যায় না, অখণ্ড আমাদের ইন্দ্রিয়-দৃষ্টির আয়ত্তে

আসে না, তাই বলি তাঁর রূপ নেই, তিনি 'অন্ধকার' (পূরবী)—তিনি অরূপ। অখণ্ডতা-ই অরূপ। অরূপ অখণ্ডের একটা নূতন নাম।

ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় সীমার আলো-সত্তার। দিগন্তপ্রসারী সর্বব্যাপী অসীমের আলোচ্ছটা প্রভাসিত হয় ধ্যান-দৃষ্টিতে। এই ধ্যানদৃষ্টি যাঁর সদাজাগ্রত, তিনিই অখণ্ডকে জানতে পারেন। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্র-মানসে অখণ্ড ধরা দিয়েছেন বলে' বিশ্বসৃষ্টির কুত্রাপি তিনি 'খণ্ডতা' লক্ষ্য করেন নি। দিক, দেশ, কাল, জীব, জীব-সমাজ, জীব-জীবন, অথবা মরণ,—কোথাও, কোনো ভাবের বিচ্ছিন্নতা বা বিশ্লিষ্টতা তিনি সহ্য করেন না, স্বীকার করেন না। সর্বত্র একটা সমগ্রতার চিত্র তিনি প্রকটিত হতে দেখেন, বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্র তিনি সমগ্রতার সুর ধ্বনিত হতে শোনেন। এইজন্য জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে' দেখা তাঁর মতে, যুক্তিসম্মত নয়। মুহূর্তবাদীরা জীবনের সামান্যতম একটি মুহূর্তের সঙ্গে অপর মুহূর্তের যোগসাযুজ্য খুঁজতে চান না, কিন্তু রবীন্দ্র-দর্শনে শুধু এক জীবন নয়, অগ্রবর্তী বা পরবর্তী জীবন নয়, বিশ্বজীবনকে-ই এক করে অখণ্ডরূপে দেখবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইজন্যে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মৃত্যু ভয়াবহ একটা চরম নিবৃতি নয়, জীবনের গতিহীন পরিসমাপ্তি নয়—প্রবহমান জীবনেরি তা' একটা নবতম তরঙ্গতুল্য। (পূরবী ঃ অবসান, শেষ। বীথিকা ঃ মরণমাতা) শ্যামসুন্দর যেমন শ্রীমতীর জীবনে সমায়াত হয়ে তাঁকে প্রমুদিত করেছিলেন নবজীবনে, নবরূপে,—মৃত্যু-ও তেমনি প্রেমিক শ্যামেরি মত জীবকে নবরূপে গতিদান করে, জাগরিত করে। রবীন্দ্র-দৃষ্টির আলোকে স্নাত হয়ে মৃত্যু আর ভীষণদর্শন বিকটাকার কোনো 'ইওয়ানোডন্-কল্প' রাক্ষসরূপে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে 'শ্যামসমান' মনোমোহনরূপে।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই কথাগুলিতে কবিত্বসুলভ উচ্ছ্বাস আছে বলে' মনে হলেও, এর অন্তরস্থিত দার্শনিক সত্যতাকে স্বীকার না করে' উপায় নেই। অখণ্ডতত্ত্বে উপলব্ধি এলেই, মানুষ বুঝবে ঃ মৃত্যু জীবনের আর এক রূপ ঃ জীবন ও মৃত্যু এক, অখণ্ড মহাজীবনেরি দুই রূপ। চক্রাকারে এই রূপদ্বয় নিত্য আবর্তিত হয়ে জীবজগৎকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে চলেছে। বিশ্বজগতে

'জন্ম অর্থাৎ জাগরণ-ই একমাত্র সত্য, মৃত্যু বলে' এখানে কিছু নেই—দার্শনিক এই বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতেও যুক্তি ও যন্ত্রসাহায্যে স্বীকৃত হয়েছে।

জীবন তাহলে' 'চিরনবীন', সে নিত্য-নূতনকে জানছে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাচ্ছে,—দার্শনিক ভাষায় ঃ জন্মামৃতসমুদ্রে নিত্য অভিস্নাত হচ্ছে; তার মৃত্যু নেই, তার মৃত্যু হয় না·; কেননা জীব-জীবন এবং মৃত্যু-জীবন —এই দুই জীবনকে এক করে' অখণ্ড-জীবনই বিরাজ করছেন। মৃত্যুহীন এই অখণ্ড-জীবনের ব্যাপ্তি দূরগত অতীতে, সমায়াত বর্তমানে, অনাগত ভবিষ্যতে। মৃত্যু কোথাও নেই; তাই অতীত মরেনি, জন্মলাভ করেছে বর্তমানরূপে; বর্তমান মরবে না, জন্মলাভ করবে ভবিষ্যমূর্তিতে। কালের এই জন্ম থেকে জন্মান্তরে, এক থেকে আরে, গতাগতির ছন্দ হৃৎস্পন্দনে অনুভব করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর কিছু না, এক অখণ্ড কাল প্রবাহ মাত্র। মানুষ আপন সংকীর্ণ বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করবার অভিলাষে অখণ্ড কালকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ,—বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, পল, অনুপলের বিশ্বখণ্ডে বিখণ্ডিত করে' নিয়েছে, অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র, জন্ম দিয়েছে পঞ্জিকা, ক্যালেণ্ডার। বস্তুতঃ নিত্যগতি, অথচ স্থির ধীর মহাকালের অখণ্ড-প্রবাহ অনাদ্যন্তকাল ধরে' ঠিক একভাবেই অব্যাহত রয়েছে। খণ্ডদৃষ্টিতে কালের যেটা গতি, অখণ্ডদৃষ্টিতে সেইটাই আবার চিরস্থিতি। একই জিনিস, তাই দুয়ের মধ্যে 'মিল' না থেকে পারেনি; থাকার কথা বলাই যেন বাহুল্য। (বলাকা)

কাল-দর্শন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কালের অখণ্ডত্ব নির্ণয় প্রয়োজনবোধে দু-একটা কথা বলা হলো। বলা হলো ঃ অতীত মৃত্যু পায় না, সে বর্তমান প্রবাহে সঞ্চারিত আছে। বর্তমান মৃত্যু পাবে না, সে ভবিষ্যতের তরঙ্গভঙ্গে নিত্য নৃত্য করবে।

মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অতিক্রম করে' অনেক-গুলো 'আমির' ভেতর দিয়ে—বহু অবস্থায় সে পরিচিত হয় বহু 'আমির' সঙ্গে—অভিজ্ঞতাও নানা, 'আমি'ও নানা। শৈশবে এক 'আমি', কৈশোরে আর এক

'আমি', প্রৌঢ়ে দেখে আর এক 'আমি', বার্দ্ধক্যে হয়ে পড়ে আর এক সম্পূর্ণ 'আমি'। কিন্তু এ সব কটা 'আমির' মধ্যেই যে সে এক অখণ্ড 'আমি' রয়েছে তার সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে সুপ্রকাশিত হয়ে না উঠলেও উনচেতনের (Subconscious) স্তরে যে ভাস্‌ছে সে বলাই বাহুল্য। নানাত্বের মধ্যে একত্বের বা তাদাত্ম্যের বোধ তার আছে। এই যে বহু-'আমি'র একত্ববোধ, এই যে অখণ্ডতার উপলব্ধি, এই যে sense of personal identity, এইটাই রবীন্দ্রনাথকে মহাকালের অখণ্ডত্ব বা একত্ব উপলবব্ধির পথে সহায়তা করেছে। অনাদি, অনন্ত মহাকালের অখণ্ড 'আমি'-সত্তাকে নিজের মধ্যে ধ্যান-দার্শনিকতায় পূর্ণস্বরূপে প্রতিভাত করে' নিয়ে অতীতকে তিনি মনন করেছেন, ভবিষ্যৎকে দর্শন করেছেন। মহাকালের জীবনে, বলাই বাহুল্য, দূরগত অতীতটা হচ্ছে শৈশবকল্প, বর্তমানটা কৈশোরকল্প, অনাগত ভবিষ্যৎটা স্বপ্নময় যৌবনকল্প। আজ যদি জ্ঞান-সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে মহাকালকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, বিরাট যে-শৈশব-অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নানা গল্পে, কল্পে ও কথায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, সেটা কার জীবনের? তাহলে সে নিশ্চয়ই উত্তরে এই বলবে: আমি একত্ব-কে জানি; আমার personal identityর জ্ঞান আছে। তাই বলতে পারছি, সেটা আমারি। বলতে পারছি: অতীতটা 'আমি'-র, বর্তমানটা 'আমি'-র, এবং ভবিষ্যৎটা 'আমি'-জীবনেরই ভগ্নাংশ।

ব্যক্তিগত খণ্ড-জীবনের একত্ববোধের আলোকে সমষ্টিগত অখণ্ড-মহাকালের বিশ্বরূপদর্শন রবীন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হওয়ায়, তিনি বিরাট অতীতকে সংগ্রামশীল বর্তমানের, সংগ্রামী বর্তমানকে স্বপ্নোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে একটানা কালপ্রবাহ নিরীক্ষণ করবার যুক্তি পেয়েছেন। ফলে, আধুনিক নিছক বর্তমান-বাদিদের মত বর্তমানটাই সব, এ-কথা বলতে পারেন নি; জীবনতত্ত্ব এবং সভ্যতার ইতিবৃত্তে 'ল্যাজামুড়োহীন উদরসর্বস্বতা' তাঁর মতে অশাস্ত্রীয় দার্শনি-কতা। (স্বদেশ: নূতন ও পুরাতন, 'নববর্ষ')।

বস্তুতো, মাত্র বর্তমানকেই যদি স্বীকার করা যায়, presentকেই যদি living বলে' স্বীকার করা হয়, তাহলে মৃত অতীত আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ বর্তমান থেকে বিযুক্ত হয়ে 'খণ্ড-কাল-কারাগারে' জীব-জীবনকে বন্দী করে'

ফেলে। বর্তমানবাদিদের মতে, জীবন-নাটক কেবল বিয়োগাঙ্কই অভিনয় করে। জীবন থেকে, তাদের মতানুযায়ী, বিয়োগ করতে হয় অতীত-কে, বিয়োগ করতে হয় ভবিষ্যৎকে, বিয়োগফল থাকে শুধু বর্তমান, যা' নিয়ে তাদের কারবার। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে যদি তারা দেখে, তা' হলেই বুঝতে পারবে, একটি সামান্য মুহূর্তের মধ্যে ভূতভবিষ্যৎবর্তমান ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে রয়েছে—বর্তমান প্রতিমুহূর্তে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে ভবিষ্যতের মুখে এগোচ্ছে চুম্বকের টানে লোহার মত। এক মুহূর্তের পক্ষে যেটা সত্য, অনন্তকালের পক্ষেও সেটা সত্য।

অখণ্ড জীবনের তত্ত্ব-কথায় যোগ-সাধনই হলো প্রয়োজনীয় কথা, বিয়োগ সাধন নয়। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও দেখতে পাই, আমরা তাই। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী —যোগ-ই অমরত্ব, বিয়োগ অপমৃত্যু। তাঁর মতে সেই মানুষ অমৃত-কে জানে, যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কেন্দ্রস্থলে ধ্যানবলে সমাসীন হয়ে সনাতন সমন্বয়-সত্যকে, অখণ্ড-যোগতত্ত্বকে উপলব্ধি করে। ব্যক্তিগত এক মানুষের পক্ষে শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে এক অখণ্ড 'আমি'-কে নিরীক্ষণ করা যেমন সহজ, অখণ্ডোপাসক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মহা-কালের বিভিন্ন যুগাবস্থার কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়ে তার অখণ্ড প্রবাহের নিত্যগতি এবং চিরস্থিতির রহস্য উপলব্ধি করা তেমনিতর সহজ হয়েছে।

বস্তুতঃ, অখণ্ডের আলোকদর্শনে সে প্রয়াসী নয়, এবং খণ্ডের প্রতিই তার চিত্ত আসক্ত হয়, তখন অন্যান্য খণ্ডের প্রতি অন্যায়াচরণটাকে সে পাপ মনে করে না। সে স্পর্ধিত হয়, নিঠুর হয়; সে পরের প্রতি অন্ধ হয়; সে ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করতে চায়। সে কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রি-দিন বর্মে-চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হয়ে বসে থাকে, সে আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করে রাখে—তার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, (পূরবী ঃ চিঠি) সে স্বার্থের কূপমণ্ডু-কতায় লুপ্ত হয়, সে প্রচ্ছন্ন থাকে।

কিন্তু অখণ্ডকে যিনি জানেন, "যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন, এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে, সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, সে হয় প্রকাশিত।" (শিক্ষার মিলন)

বলা নিষ্প্রয়োজন, যে, অখণ্ড-তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি না এলে' মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ-তত্ত্বটির সার সংগ্রহ করা অসম্ভব। সকলের মধ্যে আপনাকে তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁর আত্ম-শিক্ষার সাধনায় দেশগত বা কালগত কোনো গোঁড়ামি নেই; দেশগত বিভিন্ন শিক্ষার সর্ববিধ খণ্ড-তত্ত্বের একত্র সমন্বয়ে যিনি সমগ্র অখণ্ড সত্য তত্ত্বকে আবিষ্কার করে' নিতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ তা' স্বাভাবিকভাবেই জানেন বলে' তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের অভ্রান্ত উপায়-তত্ত্বই নির্দেশিত হয়েছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—এই উভয় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন একত্র করে' এক অভিনব ঐক্য দর্শনের সম্ভাবনায় তিনি সাধন-তৎপর ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন ঃ প্রাচ্যকে আজ বহির্মুখী শিক্ষায় 'বিজ্ঞান' শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, ইহলৌকিক বস্তুজীবনকে জয় করতে হবে শক্তিবলে; নইলে সে পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকবে চিরকাল। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যকে শিক্ষিত হতে হবে অন্তর্মুখী শিক্ষায়, 'তত্ত্বশিক্ষায়'; নইলে জাগতিক চরম উন্নতি থাকা সত্ত্বেও সে বর্বরোচিত জিগীষার উত্তেজনাতেই থাকবে প্রমত্ত। বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলন হলো শিক্ষার মিলন। "এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্য-পীড়িত ও নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

কিন্তু এই মিলন সম্ভব হবে কখন ?—নিজেকে জানলে এবং মানলে, এবং পরকে পরম আন্তরিকতা সহকারে জানবার ও মানবার সততাপূর্ণ সদিচ্ছার সাধনা করলে। এই মিলন, পূর্ব-পশ্চিমের এই মিলন, জাতির সঙ্গে জাতির, একের সঙ্গে অপরের এই মিলন, সম্ভব হবে। রবীন্দ্রের নীতিদর্শন (Ethical philosophy) ও ধর্মনীতির (theology) মূল

কথা হচ্ছে এই নিজেকে জানার ও মানার আগ্রহ, এবং পরকে জানবার ও মানবার সদিচ্ছা।

রবীন্দ্রের নীতিদর্শন ও সমাজতন্ত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর মতে ব্যষ্টিগত মানুষ সাধনবলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করবে, বিকাশ করবে মঙ্গলের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে।—তারপর বৃহত্তর কল্যাণকামনায় স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে সমষ্টি-মঙ্গলে, সমষ্টি জানবে, সকলকে আত্মজ্ঞানে জীব-জীবন ধারণ কবে' যাবে, কিন্তু আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হারাবে না, পব-জাতির স্বাতন্ত্র্য হরণ করবার অভিলাষ স্বপ্নে কখনও পোষণ করবে না। তাকে মনে রাখতে হবেঃ "একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যাবা পর-জাতির স্বাতন্ত্র্য হরণ কবে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপেব ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে' প্রচাব করে।"

বোঝা যাচ্ছেঃ Imperialist বা fascist দের মতো সমগ্র বিশ্বজগৎকে আপন বন্দীত্বের বন্ধনে এনে' অখণ্ড এক কর্তাভজাব বংশ সৃষ্টির অপরূপ সন্নীতি তিনি সমর্থন করেন না; State Socialist দের মতে, সমষ্টির যৌথ যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে তিনি বলি দিতেও চান না, অথবা উগ্রপন্থী individual anarchist দের মতো সমষ্টি-কল্যাণে উদাসীন, সম্পূর্ণ বেপরোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দিতেও পাবেন না। ব্যক্তি, তাঁর মতে, একটি ফুলের মত প্রমুদিত হবে প্রকৃতির উদ্যানে, আপন রূপে, রসে, গন্ধে প্রমুদিত করবে পৃথিবী, আপন 'বিশেষ শোভা' বিকাশ করে' যাবে অবিশ্রাম; স্বপ্নেও ক্ষতি করবে না অন্যান্য কুসুমকলিকার,—পরন্তু অন্যান্য কুসুমের সঙ্গে মিলিত থেকে উদ্যানের মধ্যে এক অভিনব সমগ্রতার রূপ বিকশিত করবে। একদিকে নিজেকে, অপরদিকে নিজেকে সকলের মধ্যে মিলিত রেখে'—সকলকে, সম্পূর্ণরূপে সুন্দর ও শোভন করার সদিচ্ছাই হচ্ছে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টিকে মিলিত করার নীতিদর্শন।

মিল-এর Utilitarianism-এর মধ্যে লোকমঙ্গলের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রের এই নীতিদর্শনের বিশেষ পার্থক্য আছে। বলা বাহুল্য;

মিলের মঙ্গলবাদ সামাজিক কর্তব্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত; রাষ্ট্রনৈতিক বিধিবিধানের প্রভাব আছে তার মধ্যে। ব্যক্তিকে অন্তরে-বাহিরে বিকশিত করবার, নিজেকে জানবার এবং পরকে মানবার, স্বাত্মার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার এবং পরাত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করবার কোনো ইঙ্গিত তাতে মেলে না। রবীন্দ্রের নীতিদর্শন ধর্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম করবে, সে নিজেকে যেমন জাগরিত করবে, অপরকে জাগরিত হবার তেমনি সুযোগ দেবে। স্বেচ্ছায় "হবে," অন্যে যাতে "হয়" স্বেচ্ছায় তার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে রাজনৈতিক আইনবিধানের কোন চাপ নেই, ধর্মনৈতিক চিত্ত-প্রসারের জ্যোতিঃ সম্পদই আছে।

নীতিদর্শনকে সার্থক করতে হলে, তাই, ধর্মের প্রয়োজন আছে। ধর্ম-সাধনা, রবীন্দ্রনাথের কাছে, প্রেম-সাধনা। প্রেম না হলে ধর্ম নিরর্থক, কল্যাণ বা শান্তি অমূলক-স্বপ্নকল্পনা। (শান্তি-নিকেতন)।

প্রেমের সূর্য-সাধনায় অন্ধকার দূরীভূত হয়, অহংকার চোখেব জলে যায় ধুয়ে, মাথা নুইয়ে আসে আনন্দের ভক্তি-প্রেরণায়। মানুষের প্রতি অবিচার বা অনাচার করতে তখন স্বাভাবিকভাবেই আর ইচ্ছা জাগে না। সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে অখণ্ডরূপে, আত্মারূপে দেখবার তখন দৃষ্টি খোলে। ঐক্য-তত্ত্ব তখন আর পুঁথির পাতায় থাকে না, উপলব্ধিব মণিমঞ্জুষায় সঞ্চিত হয় মহাবিত্তের মত। রবীন্দ্রকাব্যে ও দর্শনে প্রেমের তপস্যা তাই সবার আগে। রবীন্দ্র বলেন: প্রেমের ঈশ্বর দয়া না করলে, সব সাধনাই শূন্য, সব তত্ত্বই ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত।

এই প্রেমের ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন; শুধু জানতে পারিনি, জানতে চাইনি, তাই ইনি আমা থেকে দূরে রয়েছেন বলে' মনে হয়। যখন দূরে আছেন বলে' মনে হয়, তখন এঁকে বলি "তুঁহু"। 'তুঁহু' বলার অর্থ আর কিছু নয়, স্বাত্মাকে স্বীকার করে' নিয়ে পরমাত্মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। রবীন্দ্রদর্শনের এই হলো দ্বৈতবাদ। আবার যখন প্রেমকে অনুভব করি অন্তরে, যখন এঁকে পেয়ে যাই, যখন ইনি অন্তরে সূর্যের দীপ্তিতে জাগ্রত হয়ে আমার অন্ধকার দূর

করেন, অসত্য নাশ করেন, অমৃতের পথে টান দেন পরম স্নেহাবেগে, তখন ইনি আর 'তুঁহু' নন, "অহম্"—আমি প্রেম, আমি সুন্দর, আমি সত্য ও কল্যাণ, আমি বিস্তৃত করবো নিজেকে, আমি গান গাইবো, আমি ফুল ছড়াবো, আত্ম-'নির্ঝরের' যখন 'স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে, এইবার 'করুণাধারা' ঢালবো। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করব। 'একপ্রেমে' 'সর্বপ্রেমতৃষা' নির্বাপনের সাধনা করব। 'দিনান্ত-সংগীতধ্বনি'র রোমাঞ্চে উপলব্ধি করব নূতন-জীবন। 'চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে' উপনীত হয়ে দর্শন করব মহারূপ। 'আমিহীন চিত্তমাঝে' তাঁর প্রেম আস্বাদন করব পরমানন্দে। রবীন্দ্রদর্শনে এই হলো একপ্রকারেব অদ্বৈততত্ত্বোপলব্ধি।

বস্তু-জীবন ও ভাব-জীবন গভীরভাবে মনন ক'রে' দেখলে অর্থাৎ মনোদর্শনের আলোকে দেখতে গেলে, বোঝা যায়, দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই দুই তত্ত্বের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। বস্তু-জীবনে সত্য সত্যই আমরা ঈশ্বব থেকে নিজেকে সব সময় অভেদ ভাবতে পারি নে, আবার আবার ভাবজীবনে মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে তাঁর সঙ্গে নিজকে অখণ্ডস্বরূপে দেখেও ফেলি। রবীন্দ্র-দর্শনে তাই উভয় তত্ত্বের প্রতিই সত্যস্বীকৃতির সৌন্দর্য আছে। মোটামুটি ভাবে ধরলে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিকতাব রহস্যটুকু বাদ দিলে, তাঁর ধর্মতত্ত্বকে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল জীব গোস্বামীব অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের কাছাকাছি বলে' মনে হয়।

বস্তুতঃ, ভগবান প্রেম-কৃষ্ণ আমা থেকে ভেদ-ও বটেন, বিভেদ-ও বটেন। তিনি আমাতে আছেন, তত্ত্ব-সাধনায় ও শুদ্ধি-প্রেরণায় তিনি আমার মধ্যে জাগরিত হন, চিত্ত-রাধার সঙ্গে একত্র আলিঙ্গিত হয়ে লীলাবিলাসে রাসোৎসবে প্রমুদিত হন; বলেন: হৃদয়েব এই ব্রজধাম ত্যাগ করে' "পাদমেকং ন গচ্ছামি।" আবার আমাকেই নবতম এক বিরহসত্যে জাগরিত করবার জন্যে অন্তর্বৃন্দাবন ত্যাগ করে' কখন যেন লুকিয়ে যান, হৃদয়-বৃন্দাবন তখন "অন্ধকার" বলে' মনে হয়,—আমা থেকে দূরে, দূর-দ্বারকায় থেকে' আমাকে তখন যেন বলান: "তুহুঁ কই" "তুহুঁ কই"!—তাই কাঁদতে থাকি ব্যাকুল বেদনায়। চিত্ত-রাধা যত ব্যাকুল হয়, ততই 'তুহুঁ' প্রভাসিত হতে থাকে।

দেখি : আমার চারিপাশে আমারি আনন্দ-বধনে ভগবান প্রেমকৃষ্ণ বিশ্ববৈচিত্র্যে লীলা করছেন, অদৃশ্যে থেকে-ও দৃশ্যমান হয়েছেন ওই নীলাকাশে, ওই শ্যাম-সমাচ্ছন্ন বৃক্ষাকীর্ণ ঘন-অরণ্যে, ওই সাগরে, ওই কৃষ্ণ-পর্বতে, ওই বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন : তিনি 'কাছের'-ও বটেন, 'দূরের'-ও বটেন; 'দৃশ্য'-ও বটেন; 'অদৃশ্য'-ও বটেন; 'অহম্'-ও বটেন আবার 'তুহুঁ'-ও বটেন; তিনি রূপে রূপে, প্রতিরূপে-ও বটেন, 'বহিশ্চ'-ও বটেন।

সহজেই তাই বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ 'স্পিনোজা' নন; ব্রহ্মকে একমাত্র নির্বিশেষে substance বলেই তিনি ক্ষান্ত হন না। তিনি 'ডেকার্ড'-ও নন; প্রকৃতিসৃষ্টির অব্যবহিত পরেই স্রষ্টীশ্বর সৃষ্টির সান্নিধ্য ছেড়ে অন্যত্র অদৃশ্যে বাস করছেন 'পেন্‌সনার'দের মত—প্রকৃতি থেকে তাঁর এই নিত্য-ভেদতত্ত্বে তিনি শ্রদ্ধাবান নন। পরন্তু স্পিনোজার 'ইমানেন্‌স্' এবং ডেকার্ডের 'ট্রান্‌সেন্‌ডেন্স'—এই দুই তত্ত্বকে সমন্বিত করে' এক অখণ্ড-তত্ত্বে, ঈশ্বরীয় সর্বব্যাপিত্বে, প্রেমের নিত্য-ব্যাপ্তির সর্বসত্যে, তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন। "সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে' যে-একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন, তবে বেদনার এই গতি কখনই এমন বেগবান হোতে পারত না। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে।" (পাপের মার্জ্জনা : শান্তি নিকেতন।)

মানুষের জন্য মানুষের সর্বজনীন বেদনা-বোধের অস্তিত্ব থেকে প্রেমের বিশ্বব্যাপিত্ব তিনি এইভাবে উপলব্ধি করছেন।

প্রেমের নিত্যব্যাপ্তির এই সত্য যখন সর্বমানুষের উপলব্ধির বিষয় হবে, মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে, পূর্ব-পশ্চিমে তখন আর ভেদ থাকবে না। কবি কিপ্‌লিঙ্‌-এর অশ্রদ্ধেয় মতবাদ (পূর্ব-পশ্চিম কখনও এক হবে না) ধূলিসাৎ হয়ে যাবে চকিতে। বিজ্ঞান ও তত্ত্বকথা তখন একত্র মিলিত হবে, পূর্ব হাত

পাতবে পশ্চিমের কাছে, পশ্চিম হাত পাতবে পূর্বের কাছে। উভয়ে উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হাত ধরাধরি করে চলবে অসৎ থেকে সতের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে। বলবে ঃ প্রেমের সাধনায় মিলনকে যখন জানা হয়েছে, তখন—

ওগো রাণী
সফল হয়েছে যাত্রা আমার, শুনেছি আশার বাণী।
বসন্ত সমীরণে
তব আহ্বান মন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধ মাতাল দিনে
ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায়
গাহিব তোমার জয়।
—ইটালিয়া।

রবীন্দ্রনাথের

সোনার তরী

॥ মূল্য ঃ দুই টাকা ॥

বিশ্বভারতী ঃ অনেক সমালোচকই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য বা নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সোনার তরী' তার একটি চমৎকার ব্যতিক্রম।···এই সুমিষ্ট ভাষায় অন্তরের দরদ দিয়ে লেখা বইটি বহুসমালোচিত রবীন্দ্রকাব্যের উপরেও নূতন আলোকপাত করেছে।···ব্যাখ্যা অতি চমৎকার। ভাষাটি মিষ্ট—সব মিলিয়ে সত্যকারের ভালো সমালোচনা।···

যুগান্তর ঃ তাঁহার রচনা যেমন প্রাঞ্জল, হৃদ্য ও অন্তর্মুখিতাযুক্ত, রসদৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ ও প্রত্যয়দীপ্ত!···একই-সঙ্গে জ্ঞানের ও আনন্দের উপকরণ অনেক পাইবেন। নূতন পথে ভাবার এবং সেই ভাবনাকে জীবনের মধ্যে খোঁজার যে প্রেরণা দিয়াছেন গ্রন্থকার, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বইয়ের ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

আনন্দবাজার ঃ লেখক রবীন্দ্রানুরাগী। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। সেই সঙ্গে তাঁর রয়েছে একটি সচেতন শিল্পী মন। তাই 'সোনার তরী'র প্রত্যেকটি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও সাহিত্য-রসাশ্রিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক হিসাবে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হবে।

দেশ ঃ এই পুস্তকটি কিন্তু সমালোচনার ভিড়ে স্বকীয় মহিমায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেবে। কারণ অমিয়বাবুর আছে একটি অনন্যসাধারণ ভাবদৃষ্টি এবং তার প্রকাশভঙ্গীতে আছে রসনৈপুণ্য···অমিয়বাবুর রসবিচার এমনি উপভোগ্য, যেন একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টিধর্মী রচনা। প্রকাশক অত্যুৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধাই দিয়ে বইটিকে সম্মানিত করেছেন।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

॥ মূল্য ঃ দুই টাকা চার আনা ॥

রবীন্দ্র শাস্ত্রালোচনায় তপনকুমার অধ্যাপক হিসাবেই নয়, লেখক হিসাবেও যে বিশেষ কৃতী ও পারংগম, 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'ই তার সাক্ষ্য দিল। এ গ্রন্থে 'খেয়া' 'চিত্রা' 'সোনার তরী' প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচনাগুলি সুখপাঠ্য শুধু নয়, নূতনত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ।

বিশ্বভারতী ঃ 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন। লেখক পূর্বে কতকগুলি বাঁধা তত্ত্বের অবতারণা করে তাই দিয়ে বিচার করতে চান নি। বরং তিনি প্রকৃত সাহিত্যসম্মত পথে অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "জীবনের সত্য আস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠে তত্ত্বরূপে নহে,...

অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঃ তত্ত্ববিচার অপেক্ষা রসবিচার বড় হয়ে উঠেছে। রচনার ধারার ভিতর রসলিপ্সু চিত্তের সৌরভ অনুলিপ্ত হয়ে আছে।... এ গ্রন্থ তাঁর পূর্বখ্যাতি আরও বাড়িয়ে দেবে।...

উত্তরপথ ঃ তপনবাবুর আলোচনা দার্শনিকতাপূর্ণ এবং প্রতিটি অধ্যায়ে চিন্তাশীলতার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ব যে কোথাও জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাস্তব-সম্পর্কহীন তত্ত্ব হয়ে ওঠেনি তপনবাবু এই বইয়ে তাই-ই বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে জীবনের সঙ্গে যে তত্ত্বের একটা নিগূঢ় যোগ রয়েছে তপনবাবু তাই-ই 'ছোট আমি তথা খাঁচার পাখী এবং বড়ো আমি তথা বনের পাখীর' উদাহরণে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তপনবাবুর আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষার লালিত্য। আলোচ্য বইটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিশেষ উপকৃত হবেন।

গল্পকার শরৎচন্দ্র

॥ মূল্য ঃ ছয় টাকা ॥

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই আলোচনাকে বিস্ময়বিহ্বল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ প্রশস্তি রচনা হইতে তথ্যপ্রাচুর্যসমর্থিত, যুক্তিনিষ্ঠ, বিচারপ্রতিষ্ঠিত মূল্যনির্ধারণের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে, ইহা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে।···

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত ঃ ভাল সমালোচনার বই আমাদের বাঙ্‌লা-সাহিত্যে খুব কম; অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা রায় তাঁহাদের যত্নে ও পরিশ্রমে বাঙ্‌লাভাষায় একখানি ভাল সমালোচনাব বই প্রকাশ করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।···

দেশ ঃ প্রতিটি গল্পের খুঁটিনাটি আলোচনায ধৈর্যশীল যে গবেষক মনের পরিচয় মেলে তা ভবিষ্যতে বাঙ্‌লাসাহিত্যের এই প্রায়-অবজ্ঞাত শাখাকে সমৃদ্ধ করবে এমন আশা নিঃসন্দেহে পোষণ কবা যায়।···

যুগান্তর ঃ প্রায় সাড়ে চাবিশত পৃষ্ঠার এই প্রকাণ্ড পুস্তকে অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রেব গল্পগুলির বিস্তৃত, তীক্ষ্ণ এবং গভীর সমালোচনা কবা হইয়াছে। ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া ক্রমবিকাশের ধাবা অনুসারে গল্পকাব শরৎচন্দ্রের এই প্রকাব বিশ্লেষণ আমাদেব চোখে পড়ে নাই!···

Amrita Bazar Patrika : Introductory portion is both analytical and informative. It throws much light on Saratchandra the man and the artist. The book will be helpful to both student and common readers...